বাদল ধারা



শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।



বরেন্দ্র লাইব্রেরী,
২০৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

দাম—দেড় টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—বি, এন, ঘোষ,
আইডিয়াল প্রেস,
৮।১।১, মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

উৎসর্গঃ—

সুপ্রসিদ্ধ মহাপ্রাণ জমিদার—

শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র—

মদীয় অগ্রজপ্রতিম—

শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর পাঁড়ে, মহাশয়ের

শ্রীকরকমলে।

রতন দা,

ছোট ভাইটির মতই স্নেহ করেন বলে, ভা'য়ের আদর-আব্দারও সইতে হবে।...ক্ষুদ্র এ ভক্তি-উপহার তুচ্ছ হ'লেও—আপনার ভা'য়ের, সুতরাং নিতে হবে, এবং আশীর্ব্বাদ না করলেও চ'লবে না।

আশ্বিন—১৩৩৫,
চিত্তমোহিনী লাইব্রেরী,
সাটুই (মুর্শিদাবাদ।)

স্নেহার্থী
ব্যোমকেশ।

—উপহার—

....

....

....

বাদল ধারা

সুপ্রিয়া বল্‌ছে—

—ঠিক দুপুর বেলা !...ভরা দুপুরে নৌকোয় চাপ্‌লাম। চাপ্‌লাম বটে, কিন্তু মা স্বর্গে যাওয়ার দিনে যত দুঃখ হ'য়েছিল তার চেয়েও আজ দেশ ছেড়ে বিদেশের উদ্দেশে যাত্রা করতে আমার ঢের বেশী দুঃখ হ'ল।

কথায় বলে—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী—

আমার জননীও নাই আজ জন্মভূমিকেও প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিতে হ'ল।...কপালখানার বাহাদুরী আছে। এমন নির্ব্বিবাদে দুঃখ—শোক—যাতনা—ব্যথা—জগতের যা কিছু কষ্টের আছে, সবই মুখ বুজে সইতে পারার শক্তি কপালের ছাড়া দুনিয়ায় আর কারো আছে কিনা জানি না। মানুষের দেহেরও কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এত বড় ধৈর্য্য নাই।

যাক—বাজেই হোক্ আর কাজেরই হোক্—এটা আমার আসল কথা বলা নয়,—আসল যা. তা-ই এখন বল্‌তে সুরু করবো।

—ক বছরই বা হবে !—সেই যেবারে জার্ম্মাণদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই বাধে !—আমার বাবা সুরেন বাঁড়ুয্যের বক্তৃতার জোলুসে আত্মবিস্মৃত হয়ে রাজার জন্যে জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতলব এঁটে, 'প্রতিজ্ঞা-পত্রে' সই ক'রেছিলেন। তারপর সই করার দিন কতক

পরে, ফুলের মালা গলায় দিয়ে, স্ত্রী-পুরুষের জয়ধ্বনি কাণে শুন্‌তে শুন্‌তে মর্‌তেই হোক্‌ আর বাঁচ্‌তেই হোক্‌—যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে রওনা হ'য়েছিলেন। কিন্তু মার কথাও ভাবেননি, আমার কথাও ভাবেননি। আমি তখন বেশ বড় সড় হ'য়েছি, দু'তিন জায়গা থেকে বিয়ের সম্বন্ধ আসচে। বছর পনেরো বয়েস হ'য়েচে... !

এত বড় কর্ত্তব্য পায়ে থেঁত্‌লে দিয়ে বাবা বসোরা চ'লে গেলেন। আত্মীয়হারা সহায়হারা মা আমার স্বামীর নির্ম্মমতার জন্য কাঁদবেন, না কন্যাদায় গলায় করে কর্ত্তব্য চিন্তা করবেন—কিছুই ঠিক কর্‌তে পারলেন না।

আমি তখন ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউটে থার্ড ক্লাসে পড়ি।...

গরীবের আশা বেঘোরে মারা যায়! আমার মায়েরও তাই হ'ল। তাঁরই ইচ্ছায় বাবা আমাকে ইস্কুলে পড়তে দিয়েছিলেন, এখন তাঁর ইচ্ছাতেই আবার ছাড়তে হ'ল।

পড়াও হলনা—বিয়েও হল না। আমার কপালে খালি কান্না আর ভাবনাই বড় হয়ে বেঁচে রইলো।

বাবা চাকুরী করে টাকা আন্‌তেন—আমাদের স্বচ্ছন্দে দিন চল্‌তো। চাকুরী ক'লকাতায় না থাকুলেও, অন্য জায়গায় বজায় রইলো বটে, কিন্তু মা আমার দেশ ছেড়ে বিদেশে, বিশেষতঃ সহর জায়গায় থাকতে সাহস কর্‌লেন না।

...আমরা দেশের বাড়ীতে চলে এলাম।

দেশে এসেও পাড়ার পাঁচজন ভাল-মন্দ ভদ্র-অভদ্রের বিবিধ অত্যাচারের মাত্রাটা বেশ ভাল ভাবে সমঝে নিয়ে, মা দেশের ভরসাও

ছেড়ে দিলেন।

...আমরা চ'লে এলাম—মামার বাড়ীতে।

দেশের বাড়ীর জিনিষ-পত্র, খাট-বিছানা, বাসন-কোষণ একটাও সেখানে রইলো না,—মা খুব সাবধানী ছিলেন, তাই সবগুলি গুছিয়ে আনতে পেরেছিলেন।...

...মামার বাড়ীতে এসে দিন মন্দ কাটছিল না।

মামাদের আথিক অবস্থা মন্দ না হ'লেও বেশ ভাল ছিল না,—সুতরাং সঙ্গতিওয়ালা বোন্ আর তার মেয়ের আদর-যত্ন, মামীমা মামা—দুজনকার তরফ্ থেকেই খুব বেশী বেশী আস্তে লাগলো।

মায়ের মনে সুখ ছিল না।

পতির বিরহে পত্নীর বেঁচে থাকাটাই হয়—যম-যন্ত্রণার সামিল!—মায়ের আমার ঠিক তাই হয়েছিল।...

...বাবার একটা ছোট খাটো সংবাদও যদি পাওয়া যেত, তাহ'লে আজ আমি মাতৃহীন হ'য়ে এমন করে উপায়হারার মত হা-হুতাশ করতাম না।

দুঃখের দাবানল বুকে রেখে রেখে, মায়ের বুকখানা ঝাঁজ্রা হয়ে গেছলো। একদিন মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌লো, দিনকতক ঘুষঘুষে জ্বর হল, তারপর একদিন ভোরের বেলায় স্বর্গদূতেরা এসে, সতীরাণী জননীকে আমার পুষ্পরথে করে স্বর্গপুরী নিয়ে চলে গেল।

আমি হলাম—মাতৃহারা!

...নিজের মনের মত ক'রে গ'ড়ে তুলেছিলেন, সম্পূর্ণ আশা না পূরলেও, কতকটা লেখাপড়াও শিখিয়ে নিতে পেরেছিলেন,—তাই

মায়ের খুব বেশী রকম বিশ্বাস ছিল—আমি বোকা হ'য়ে নেই, আর পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা খুব ভাল ভাবেই বুঝ্‌তে জানি।...মরবার আগে তিনি বাক্স-প্যাট্‌রার চাবিগুলো লুকিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন—"শুক্‌নো মাটীতে জল একটুও দাঁড়ায় না মা! এদের অভাবের সংসার! যা কিছু রইলো, সাবধানে রক্ষা করিস্‌। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার মত সাহস তোর আছেই, এইটুকু বিশ্বাস আর ভরসা নিয়ে আমি আজ চোখ বুজ্‌লাম।"

মাতৃশ্রাদ্ধের সমস্ত খরচাই আমি বের ক'রে মামার হাতে দিলাম, —প্রায় হাজারের কাছাকাছি।

কিন্তু মামাবাবু খরচ ক'র্‌লেন—শ' দুই কি তার চেয়ে দু পাঁচটাকা বেশী!

কথা কইনি।

যখন আশ্রিত হয়ে র'য়েছি, তখন আপনার জনের সঙ্গে মুখোমুখী করে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়াটা ভাল মনে হয়নি।

তা ছাড়া গুরুজন!

...বছর খানেক কেটে গেল, বাবার খবর পা'ওয়া গেল না। আমি অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লাম। অস্থিরতার কারণ অনেক! একে বাবার ভাল-মন্দের চিন্তা, তার ওপর মায়ের দেওয়া যত্নসঞ্চিত আমার ধনরত্নের রক্ষণ, আর কাণা-কুঠো-বুড়ো-মাতাল ইত্যাদি কুলীন-পুত্রদের ঘরে যাওয়ার দারুণ আশঙ্কা হ'তে অব্যাহতি লাভ—এতগুলি বিষয়ের ঘাতপ্রতিঘাত চব্বিশ ঘণ্টাই আমার এই ছোট বুকখানার মধ্যে তোলপাড় করতো।

মামা কি দিনই একটা না একটা সম্বন্ধ এনে হাজির করতেন, আর মামীরা রঙ-বেরঙের ভণিতা দিয়ে আমার উঁচু আশার সাজানো কুঞ্জে কোকিলের ডাক ব'লে কাকের চীৎকার শুনিয়ে দিতেন।

মনে মনে বাবার ওপর রাগ হত, উদ্দেশে বলতাম—তোমার যুদ্ধক্ষেত্রের গোলাগুলীর একটাও যদি সেই সুদূর বসোরা থেকে আমার এই বুকখানার উদ্দেশে ছুঁড়ে দিতে বাবা! তা হলে আজ কেরোসিন তেল. কিম্বা দড়ি-আফিঙয়ের খোঁজ করতাম না।

দুনিয়ার লোক বলে ভগবান অন্তর্যামি, অন্তরের ব্যথা তিনি যেমন সহজে বোঝেন, এমন আর কেউ বোঝে না। কথাটার প্রমাণ নেওয়ার অবস্থা কখনো পাইনি, কিন্তু এতদিনে সে সৌভাগ্য হলো।

একটা পাঁড় মাতাল আর হাঁপানী রোগীর সঙ্গে মামাবাবু আমার বিয়ের সব ঠিক ক'রে ফেলে বেশ স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিলেন—এবার যদি অমত করি, তাহ'লে সেখানে আর ঠাঁই হ'বে না।

সমাজে না কি তাঁর ভা-রি দুর্ণাম র'টে গেছলো!

ষোল সতের বছর বয়েস হয়েচে, সমাজের লোক আর আমার একা-থাকা পছন্দ করেন না।

সেদিন আমার মনে হয়েছিল—আজকের সূর্য্য কালো চাঁদ লাল আর দুনিয়া হাওয়াহীন।

...নাইবার ছুতো করে নদীর ঘাটে গিয়ে কান্না সুরু করেছিলাম।

দয়া ব'লে জিনিস কি জগৎ থেকে উঠে গেছে! সহানুভূতির নাম-গন্ধ কি এখানে একদম্ নেই!...যখন ফোর্থক্লাসে পড়ি, তখন পাড়ার

লাইব্রেরী থেকে একখানা বই নিয়ে পড়েছিলাম, তাতে লেখা ছিল—সাঁতার জান্‌লে সহজে জলে ডোবা যায় না। কে একজন নায়ক অভিমানে জলে ডুব্‌তে গিয়ে পারেনি। সে ভয়ানক সাঁতার দিতে শিখেছিল। আমারও যে সেই দশা হ'ল! নইলে হায় হায়! এই নদীর ঘাটে বসে চোখের জলে বুক ভাসাতে হয়!…

এগারো বছর বয়েস যখন, তখন দেশ থেকে ক'লকাতায় যাই, তার আগেই পুকুর ঘাটে সাঁতার শেখার চূড়ান্ত করে ছেড়েছিলাম। আমার মরা হ'ল না!…

কাঁদ্‌চি—কোনদিকে লক্ষ্য নেই!…বুকজোড়া হাহাকারের ব্যথার আকর্ষণ দ'লে পিষে টেনে হেঁচ্‌ড়ে আমার দীর্ঘদিনের জমা করা আশাকে রোদনের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে চলেচে!

ঘাটে ছোট জেলে ডিঙ্গীর মত একখানা ছই ঘেরা নৌকো এসে লাগ্‌লো।

দেখি—মাঝিদের দুজন, ভিতরের লোকটিকে ধ'রে ডাঙায় নাম্‌ছে!…আহা! পঙ্গু খোঁড়া বেচারী!

—আমার বাবা!—আমার জলজলে আগুনে জলসেক করার দিন ঠিক করে নিয়ে, এতদিনে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন!

চিন্‌তে কারো বিলম্ব হ'ল না।

পিতার আর দুহিতার—দুজনের চোখ দিয়ে অশ্রু-সিন্ধুর প্রবাহ ছুটে চ'ল্‌লো!

…বন্দুকের গুলীর আঘাতে বাবার হাত-পা দুই-ই অকর্ম্মণ্য হ'য়ে গেছে!…

…বাবাকে সব কথা খুলে ব'ললাম। কেঁদে কেঁদে মায়ের স্বর্গ-প্রাপ্তির খবর দিলাম। নিজে তো কাঁদ্‌লামই, বাবাকেও চুপ্‌ করে থাক্‌তে দিলাম না। তিনি শিশুর মত ডুকূরে কেঁদে উঠ্‌লেন।

তারপর আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ব'ললেন—কপালের লেখায় হাত-পা খুইয়েচি, তাতেও দুঃখু ছিল না মা! যদি আজ তোর গর্ভধারিণী বেঁচে থাক্‌তো।…কিন্তু তবু আমি ঈশ্বরকে নির্ম্মম ব'লবো না।—তিনি তোকে ফিরিয়ে দিয়েছেন!…কিন্তু আর তো দেরী করলে চ'ল্‌বেনা সুপ্রিয়া! শীগ্‌গীর নৌকোয় ওঠ্‌! তারা জান্‌তে পারবার আগেই আমরা এখানকার সীমানা পার হ'য়ে যাই।

আমি অবাক্‌ হ'য়ে গেলাম!

বললাম—এখনি যাবে কেন বাবা?—কতদূর থেকে আসচো, তোমার খাওয়া হয়নি—

বাবা আমার মুখের কথাটা বুঝে নিয়ে বলে উঠলেন—নাওয়া হয়নি,—নিদ্রা হয়নি, কিচ্ছু হয়নি মা!…কিন্তু সব অনিয়ম আমার বরদাস্ত হয়ে যাবে,—যখন তোকে কোলে পেয়েছি!

—সতীলক্ষ্মী চলে গেছে, তোকে আমারই কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে!…যাবার সময় বলে যায়নি মনে করে হয়তো হাসচিস মা? —কিন্তু অন্তরের টান যাবে কোথা?—আমি ঠিক জানি,—সে আমারই ভরসায় তোর ওপর ভরসা রেখে—যাত্রার আয়োজন করেছিল।… ভগবানকে দয়াবান ছাড়া এত দুঃখে প'ড়েও অন্য কিছু আজ বল্‌বার নেই!…তাঁর কাছে আমার অভিমান নেই, রাগ নেই, দুঃখু নেই!— নইলে বন্দুকের গুলীতে জখম হলাম কেন?…এমন অবস্থায় না পড়লে

কি এত শীগ্‌গীর ফিরে আসতে পারতাম!...গভর্ণমেণ্ট দয়া করে আমায় দেশে আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।...কিন্তু আর না, শীগ্‌গীর উঠে পড় সুপি!...মাঝিরা আমাকে খুব ভালবাসে। রান্নার যোগাড় করে দেবে....তোর মামার বাড়ীর এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে, একটা ঘাটে নেমে নেয়ে ফেল্‌বি।...

আমি বল্‌লাম—আমাদের সর্ব্বস্ব যে মামার বাড়ীতে প'ড়ে রইলো বাবা!—মায়ের জমানো টাকাকড়ি—গহনা কাপড়—এসব না নিয়ে—

বাবা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—অদৃষ্টে যদি সুখ থাকে, তা হলে যা রেখে যাচ্ছিস তার বিশগুণ ফিরে পাবি!—ওসবের মমতা করে আখের নষ্ট করিসনি মা!...তোর পঙ্গু বাপের কী এমন সাধ্য আছে সুপ্রিয়া, যে জোর-জুলুমের সঙ্গে লড়াই করে, তোকে কুপাত্রের হাত থেকে উদ্ধার করবে?...যদি আমাকেও অগ্রাহ্য করে পয়সার লোভে, তোর মামা এখানেই বিয়ে দিতে বলেন, আমার কতটুকু ক্ষমতা তোকে ফিরিয়ে আন্‌বে?—শক্তিহীন আমি, একধারে ঘেয়ো কুকুরের মতন যাতনায় চীৎকার করে খালি নিজের বুকখানাই হাল্কা করবো, কিন্তু তোর যে আঁধার আর অকূলপাথার ছাড়া পথ থাক্‌বেনো মা!

আমি একবার নদীর ঘাটটার চারধার চেয়ে দেখলাম।—ভদ্র—অভদ্র অনেকেই ছিল বটে, কিন্তু আমাদের পানে কেউ লক্ষ্য রাখেনি। হয়তো দেখেছিল, নয়তো দেখেনি, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। বাবার কথামত ধীরে ধীরে নৌকোয় চেপে বস্‌লাম।

বাবাকেও মাঝিরা নিয়ে এলো।...

ভরা দুপুরে নৌকো চাপ্‌লাম।

আমার বাড়ীর মায়া কাটিয়ে যেতে মনে সান্ত্বনাই এসেছিল বটে, কিন্তু বাবার মুখে যখন শুনতে পেলাম,—আমরা যাচ্ছি কোন এক অনির্দ্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশে, তখন আমার দেশ,—আমার জন্মভূমির জন্য মনটা ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো!—যেখানে শিশুকাল হতে সুদীর্ঘ একাদশবর্ষ পরম সুখেই কেটে গেছে—সেখানকার সঙ্গে দেখাশুনো—জনমের মত—এই শেষ!...হায়! হায়!—স্বর্গের চেয়েও কাম্য যে জন্মভূমি, তাকে আর আমি দেখবার লোভ করে মনের মধ্যে অসীম সুখের ছবি আঁক্‌তে পাবো না!...

বাবা দেশে যেতে একদম্ গররাজী হলেন—মায়ের স্মৃতি ভেবে!

মা আমার অত্যাচারিতা হয়ে সেখানকার মমতা কাটিয়ে এসেছিলেন, বাবা অক্ষম, বলহীন তাই আমাকে নিয়ে সেখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করবার সাহস করতে পারলেন না।...

যারা একবার কদাচার করতে চেয়েছিল, তারা যে বরাবর আপন আচার ভুলে থাক্‌বে, এটুকু বিশ্বাস বাবার মনে কোন রকমেই দৃঢ় হতে পারেনি।—তাই আমাদের যাত্রা সুরু হ'ল—অনির্দ্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশ করে—কে জানে কোথায়—কোন্ সুদূর দেশের কোন্ নদীর ধারে, কেমন আলো-বাতাসের মাঝখানে!...

---

*   *

নৌকোতেই রান্না-খাওয়া শেষ হল।

বাবা বললেন—দেশে একখানা চিঠি লেখ্‌তো মা!—বাস্তুভিটেটুকু বিক্রী করে যা পাওয়া যায়. সেই ঢের। তাছাড়া ক্ষেত-খামারও তো সামান্য সামান্য আছে, সব এক সঙ্গে বেচে দেবো।

আমি ব্যথা পেলাম।

...জন্মভূমি হাজার অনাদর করুক, কোল্‌ থেকে নামিয়ে দিক, তবু সে আমার জন্মভূমি, সকল দেশের সেরা!...তার সঙ্গে এত শীগ্‌গীর—সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করতে হচ্ছে ভেবে একটুও আনন্দ পেলাম না। বললাম—এখন কিছুদিন থাক্‌ বাবা। যাকে বলে অকূলে ঝাঁপ দেওয়া,—আমাদের অবস্থা তো ঠিক তেম্‌নি!... চট্‌ করে দেশের ঘরবাড়ীগুলো বেচে দেওয়া হয়তো ভাল হবেনা।... কোথায় যে চলেছি তারই ঠিক ঠিকানা নেই, আশ্রয় পাবার আশা পর্য্যন্ত নেই, অথচ নিজস্ব যা কিছু তাই আজ সাধ করে খুইয়ে ফেল্‌বো? কাজ নেই বাবা!—থাক্‌ এখন!

বাবা হাস্‌লেন। বললেন—যারা দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়, তাদের সাহায্য নেওয়ায় যে কতখানি হীন হ'তে হয়, সে বুঝেছিল—তোর মা! তাইতো দেশ ছেড়ে চলে এসেছিল। তুইও তো বোকা ন'স্‌ মা! আমার এই অকর্ম্মন্য দেহটা নিয়ে, আপন ঘরে বসে কাঁদবো, জ্বালার যাতনায় তুই সান্ত্বনা দিবি, তবেই শেষ জীবনে শান্তি পাবো! কিন্তু তার বদলে পঙ্গু খোঁড়া আমি, অত্যাচারিতের দোরে

দোরে ঘুরে দয়ার প্রত্যাশী হয়ে কতদিন বেঁচে থাক্‌বো ?...তারা তা শুন্‌বেনা মা ! যে আমার পত্নীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছিল, সে কন্যার মর্য্যাদাও অক্ষুণ্ণ রাখবেনা, কিছুতেই না। দুনিয়ায় এইটাই হচ্ছে সাধারণের দিক থেকে বড্ড স্বাভাবিক।

আমিও কথাটা তলিয়ে বুঝলাম।

বাবাই আমাকে সংসারে এনেছেন, আমি তাঁকে আনিনি, সুতরাং অভিজ্ঞতা সকল বিষয়েই তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বললাম—তবে কোথায় যাবো আমরা ?

বাবা হাসলেন। সেই পূর্ব্বের হাসি ! বললেন—পল্লীগ্রাম সঙ্কীর্ণতায় ডুবে আছে, সেখানে আর আশা নেই মা ! আমরা যাবো—ক'লকাতায়। জন্মভূমি না হ'লেও সেখানকার সঙ্গে আমরা বেশী রকম পরিচিত।...অন্য কোথাও না গিয়ে সেখানে গেলে যে অশান্তি বাড়বেনা—এটা খুব ঠিক।...

...তাই হ'ল,—আমরা ক'লকাতাতেই আবার ফিরে এলাম।

পাঁচ দিন ছ'রাত শিয়ালদর 'আর্য্য-নিবাসে' কাটিয়ে, অনেক রকম খোঁজাখুঁজির পর, তিনশো টাকা দিয়ে বাবা একখানা খুব ছোট্ট বাড়ী কিন্‌লেন।

আমি অনেক করে নিষেধ করেছিলাম। একসঙ্গে এত টাকা খরচ করে ভবিষ্যতে কষ্ট হবে—একথাও জানিয়েছিলাম, কিন্তু বাবা আমার যুক্তিটা মেনে নিতে চান্‌নি। তিনি বলেন—বসে খেলে রাজার ভাণ্ডার ফুরিয়ে যায়, আমরা তো অতি ক্ষুদ্র গৃহস্থ ! পেটের দায়ে সর্ব্বস্ব চলে যাবে, কিন্তু শেষের দিনে মাথা গুঁজ্‌বার ঠাঁই থাক্‌বেনা।

বাবার পুঁজি মোট তিনহাজার টাকা।

...আমরা নতুন বাড়ীতে চলে এলাম।

...খোলার বাড়ী, ছোট ছোট দুখানা ঘর, আর তারই মাঝের ঠাঁইটুকু রান্নার জায়গা, দরমা দিয়ে ঘরের মত ক'রে ঘেরা।

আমার কিন্তু পছন্দ একটুও হয়নি, তবে অসন্তুষ্ট হ'য়েও থাকতে পারিনি। 'যখনকার যা তখনকার তা'র এ প্রবাদ বাক্যটা আর পাঁচজনের মত আমাকেও মেনে চল্‌তে হবে বইকি।

এমন স্যাঁতসেতে জায়গায় কখনো থাকিনি।

থাকিনি কিন্তু অবস্থা-বিপর্য্যয়ে এখন থাকতেই হবে!...দুর্গন্ধ নাকের ডগায় এসে ফিরে যাবে অথচ আমার কিচ্ছু করতে পারবে না। আমি বেশ থাক্‌বো!...যতই হোক তবু এ ভাড়ার বাড়ী নয়, আমাদের নিজের ঘর। এখানকার প্রত্যেক ইটখানা পর্য্যন্ত আমাদের নিজস্ব!

...বাড়ী খোঁজাখুঁজির জন্য বাবাকে অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়েছিল। সে জন্যে কদিনে প্রায় দশটাকা আন্দাজ রিক্সা ভাড়াই দিতে হয়েচে।

দরকারী জিনিসপত্র গুছিয়ে কেনা-কাটা করতে করতেই বাবার বিশ্রাম নেওয়ার সময় হ'লনা এখনও।

তিনি যখন বাড়ী ফিরলেন—তখন বেলা দশটা বেজে গেছে।

সব জিনিসই কেনা হ'য়ে গেছলো।

আমি সারা বাড়ীখানা ঝক্‌ঝকে করে ধুয়ে এমন সাফ্ করে ফেলেচি যে, বাবা দেখে খুব খুসী হয়ে বললেন—নাঃ দিব্যি থাকা যাবে। জঞ্জাল জমেছিল বলে ভেবেছিলাম হয়তো বাস করাই চলবেনা। তোর বেশ পছন্দ হয়েচে তো সুপি?...কেমন বাড়ী?

আমি উৎসাহের সঙ্গে বললাম—বেশ বাড়ী বাবা!...বাপ আর মেয়ে, কি দরকার আমাদের বড় নিয়ে। কিন্তু টাকাও তো বড় কম দিতে হলনা! থাকলে অন্যদিকে কাজ দিত।...আমি বছর দুই পড়ে, ম্যাট্রিকটা দিতে পারলে, দু দশটাকা আন্‌তে পারতাম, তখন তোমার ঢের সুবিধে হ'ত বাবা!

সহসা বাবার মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। সামান্যক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন—তোর গর্ভধারিণীর সে রকম ইচ্ছে ছিলনা মা! কাজেই আমি তা পারবো না। লেখাপড়া শিখিয়ে মেয়েকে রোজকার করতে পাঠাবার ভরসা করে তোকে তো আমরা ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দিইনি সুপ্রিয়া!—আমরা দুজনে চেয়েছিলাম—ভদ্রঘরের ছেলেদের যেমন উচ্চ শিক্ষা একান্ত দরকার, মেয়েদেরও তেমনিই দরকার।...আজ তোর অদৃষ্ট দোষে সতীলক্ষ্মী স্বর্গে চলে গেছে,—কিন্তু তোর যা কিছু আদর-যত্ন আব্দার-সোহাগ সব সে পুঁজি রেখে গেছে—এই আমার বুকখানার ভেতরে মা!...তার অনুরোধ—সে যে আজ আমার কাছে কতবড় জিনিস সুপ্রিয়া, সে জানি শুধু আমি, আর জানে আমার অন্তর্যামী!... কিন্তু তারই বা দরকার কি মা?...সময় হয়েচে,—দেখে শুনে তোর বিয়ে থা দেব,—তারপর এইবুড়ো তোদের ঘরেই সমান আদর যত্ন আদায় করে নেবে।...ছেলের মত ছেলে না হলে মানুষের আপশোষের সীমা থাকেনা, আবার ছেলের চেয়েও লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ ঢের ঢের মেয়ে আছে সুপি!—যারা ঐকান্তিক যত্নে তাদের মা-বাপকে শেষের দিনে সুখের চরম দিতে পারে।—তুই আমার তেমনি মেয়ে, তোর কাছ থেকে আমি এত বড় ভরসা রাখি!—বলতে বলতে বাবা যেন কন্না-

গর্ব্বে তাঁর বিশাল বুকখানা স্ফীত করে তুল্‌লেন।

আমার চোখ ছাপিয়ে অশ্রু এসেছিল!

আমি কি পারবো?—আদর্শ হিন্দুনারীর সকল গর্ব্ব সকল মাধুর্য্য করায়ত্ত করে,আমার পুণ্যশীল পিতামাতার মনোগত সাধ-আকাঙ্ক্ষাকে জয়যুক্ত করবার অদৃষ্ট কি আমার হবে!

...রান্না-বান্না শেষ করে বাবাকে স্নান করতে বললাম যখন, তখনই সর্ব্ব প্রথমে আমার নজরে পড়লো, বাবা আর এক মজা করে বসেচেন!—

—কখন কোন্ ফাঁকে, লাঠি ধরে বাইরে বেরিয়েছিলেন—আমি রান্নায় ব্যস্ত ছিলাম বলে টের পাইনি।—দেখি এরই মধ্যে তিনি একটা বাচ্চা ছোঁড়াকে ধরে নিয়ে এসেচেন—চাকর রাখবো বলে।

অবাক্ হ'য়ে গেলাম!

বাবা স্মিতমুখে বললেন—কি রে মুখ টিপে হাসচিস কেন? ...আমাদের সংসার চালাবার জন্যে বাসন-কোষন ঘটিবাটী যা যা যেমন দরকার, এই বাচ্চা ছেলেটিকেও ঠিক তেমনি দরকার খুপি!—তুই হিঁদুর ঘরের মেয়ে, আর আমি খোঁড়া-পঙ্গু-হতভাগা, কাজেই—নড়ে বস্‌তে গেলেই তোর আমার দুজনকারই দরকার হবে—এই বাচ্চাকে।

আমি বললাম—তোমার কথা শুনে রাগ হয় বাবা। বাচ্চাকে আমাদের দরকার একথা না হয় মানছি, কিন্তু বাচ্চারও যে মাসে মাসে আমাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার দরকার হবে, সেটা ভুলে গেছলে বুঝি? চাকর রেখে আরাম করার বদলে তুমি আমাকেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় অপমান করবে বাবা! সে আমি বেশ ভাল করেই

বুঝে নিয়েচি। নইলে এত বড় ধিঙ্গী মেয়ে জলজ্যান্ত বেঁচে থাকতে, একটা বাইরের অচেনা চাকরের হাতে সেবা পেতে তোমার এত লোভ? ...আমার হাত পায়ে যতদিন শক্তি সামর্থ্য থাকবে, ততদিন তোমার সেবার জন্যে আমি দোসরা লোককে বাহাল করতে দেবনা,—এ তুমি যা-ই বলো বাবা!

বাবা অল্প অল্প হাস্‌তে লাগলেন।

আমার মনে হল—আমাকে এই করে রাগিয়ে আগুন করে দিতেই বুঝি তিনি আজ চাকর নিয়ে এসে হাজির করলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—ওটাকে পেলে কোথায় বাবা?—রাস্তায় যে গড়াগড়ি যাচ্ছিল না—এটা নিশ্চয়ই।...আচ্ছা—তোমার এ বুদ্ধিটুকু হলনা বাবা!—যে, আমাদের নিজের পেটের খোরাক জুটলেই বেঁচে যাবো,—এর ওপর চাকর!...না না ওসব চল্‌বেনা। তারপর সেই বাচ্চা ছোঁড়াটাকে লক্ষ্য করে বললাম—ওরে—তোর বাড়ী কোথা? থাকিস কোন্ পাড়াতে?

ছেলেটার জবাব দেওয়ার আগেই বাবা বলে উঠ্‌লেন—ভা-রি লক্ষ্মীছেলে সুপ্রিয়া!—ওকে যত দেখ্‌বি ততই বুঝতে পারবি! আর এম্‌নি কাজ-কর্ম্ম জানে যে,ওর হাতে—সমস্ত ছেড়ে দিয়ে,দিব্যি আরামে আমাদের দিন চলে যাবে।

আমি কথা ব'লবো, না হেসেই অস্থির হয়ে পড়লাম! —হঁা—আরামেই দিন চল্‌বে বটে! কথায় বলে ঘরে ভাত নেই—ব্রাহ্মণ-ভোজনের তাড়া!...বললাম—দিন তো আরামে চল্‌বে, কিন্তু ওকে মাইনে দিতে হবে কত?

বাবা ব'ললেন—সে বেশী নয় মা! নামমাত্র যা হয় কিছু দিয়ে দিয়ো!…ছেলেটি নেহাৎ গরীব কিনা, আমার তো মনে হয় তিন-চার টাকাই যথেষ্ট,…খাবে পরবে…

আমি বলে ফেললাম—বুকে ব'সে দাড়ী উপ্‌ড়াবে—হাড়মাস চিবিয়ে খেয়ে ভিটেয় ব'সে মাদল বাজাবে…আচ্ছা—ওর অতবড় সার্টিফিকেটখানা কে দিলে বাবা? মনগড়া করে নাওনি তো?

বিস্মিত হ'য়ে বাবা বললেন—আমাদের এই পাড়ারই এক ভদ্রলোক জুটিয়ে দিয়েছেন মা! আমি নিজে থেকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিনি। তিনিই কথা পাড়লেন—যদি ছেলেমানুষ চাকর নিতে চান্ তাহ'লে খুব ভাল আর বিশ্বাসী একজনকে দিতে পারি। এর আগে বাস্তবিক বলছি—আমার ধারণাতেই আসেনি যে, চাকর রাখা আমাদের সবচেয়ে বেশী দরকারী।…এ পাড়ার লোকজন বেশ ভদ্র মা!—নতুন এসেচি—তবু কত সহানুভূতি দেখালে।

আমি বললাম—ভাল হলেই ভাল! কিন্তু যে বাবুটি তোমাকে চাকর রাখার মতলব দিলেন, আর শুধু মতলব দেওয়াই বা বলি কেন,—চাকর জুটিয়ে পর্য্যন্ত দিলেন, তাঁকে বেশ করে চিনে রেখেচ তো বাবা?

বাবার সেই অল্প অল্প হাসি!

বললেন—রামলোচন বসু—পাঁচ বছর বয়েস থেকে বিদেশে,—লোক-চরিত্র তার নখদর্পনে রয়েচে সুপ্রিয়া! চোখ দেখে আমি কেমন লোক তা এক কথায় বলে দিতে পারি। সে বাবুটি বিশিষ্ট ভদ্রলোকের ছেলে। এই পাড়াতেই থাকে।…তুই কি আমাকে

তেমনি বোকা ঠাউরে ফেল্‌লি মা যে, অচেনা এক পরের ছেলে নিয়ে এসে, আমি বিশ্বাস করে তার হাতে সর্ব্বস্ব ছেড়ে দেব? তা ছাড়া ঐ কচি দুধের ছেলে,—ওর চোখ মুখটাও তো দেখছিস, অবিশ্বাসী, চোর, দম্‌বাজ—এসব গুণ কি ঐ ছোট বুকে জায়গা পায় কখনো? ব'লতে ব'লতে ছেলেটির মাথায় হাত দিয়ে আদর করতে লাগ্‌লেন।

আমি তো অবাক্‌!

কোথায় তাড়াবার মতলব ক'রে এই ভরা দুপুরে তর্কের জাল বুন্‌তে সুরু করেছি,—ওমা!—এ যে একদম কায়েমী ব্যবস্থার পাট্টা কবুলতি নিয়ে তবে বাড়ীর ভেতর ঢুকেচে!...ভাবলাম—দূর হোক্‌ ছাই, না হয় আট আনা বাজার খরচের জায়গায় পাঁচ আনাই হবে, তবু একটা অনাথ, আশ্রয়হারা বালক,—সে তো দুবেলা খেয়ে বাঁচবে! আর মাসিক বেতন,—সে এমন কতই বা! মাছ-সন্দেশের ভাগ কমিয়ে দিয়ে তার হিসেব ঠিক ক'রে নেব।...

ছেলেটাকে বাড়ীর বারোমেসে-থাকা লোক ভেবে, সকল দিক দিয়ে তাকে বাড়ীর মধ্যেই আশ্রয় দিতে রাজী হ'য়ে গেলাম।...নাঃ—ছোক্‌রা—সত্যসত্যই করুণার পাত্র।

জিজ্ঞাসা করলাম—তোর নাম কি রে?

জবাব দিলে—কেষ্টগোপাল।

—বয়স কত তোর?—জানিস?

—পনের বছর।

—কেমন ক'রে জান্‌লি?—কে ব'লেচে?

—মা।

—তোর মা আছেন ?

—না। যখন ছিল—তখন আমার বয়েস আট বছর।...

আমি ব'ললাম—তাহ'লে আজ সাত বছর হ'ল তোর মা মারা গেছে—না ?

কেষ্টগোপাল ব'ললে—না, মা ম'রেছে—পাঁচ ছ বছর হ'ল। আমার ভাল ক'রে মনেই পড়ে না।...অধিকিরী মশায়ের ওখানেই তো বছর দুই কাজ ক'রে এলাম।

আমি ভাবলাম—ছোকরা তাহ'লে একদম আন্‌কোরা হবে না। কাজকর্ম্ম সত্যিসত্যিই জানে। ব'ললাম—বেশ বেশ, তা হ'লে তুই নতুন লোক না, কি বলিস্ কেষ্টধন ? না কি—কিরে তুই ?, ধন—না গোপাল ?

কেষ্ট মুচ্‌কি হেসে জবাব দিলে—যা আপনার খুশী, তাই ব'লে ডাক্‌বেন।

কথাটায় ঠিক সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। এ যে ডেঁপোমীর চিহ্ন! কিন্তু তাতেই বা দোষ কি ? বয়স ব'ললে পনেরোঁ, কিন্তু হিসেব দিলে—চোদ্দর। মেঘে মেঘে বেলাও তো বড় কম হয়নি কিনা!... ব'ললাম—এক কাজ কর কেষ্ট! বাবাকে নাইয়ে দিতে হবে, তেল মাখাতে জানিস্ তো ?—তোর অধিকারী বাবুদের বাড়ীতে শিখিস্ নি ?

কেষ্ট ব'ললে—সেখানে তো তেল মাখাবার দরকার হ'ত না। কেবল ওস্তাদজীর কাপড় জামা গুলোয় হপ্তা হপ্তা সাবান ঘ'সতে হ'ত।

নইলে যে মার !—বাবা !

আমি হাসতে হাসতে ব'ললাম—মার্‌তো নাকি রে ? ও বাব্বা ! ...তাহলে বেজায় সুবুদ্ধি ছেলে তুমি ?...কিন্তু সাবধান—দুষ্টুমী করলে আমিও পিঠের চামড়া আস্ত রাখবোনা—বুঝলে ?

কেষ্ট ভয়ানক মুরব্বিয়ানা চালে ব'ললে—আজ্ঞে সে আপনারা একশোবার ব'লতে পারেন। যখন পয়সা দেবেন, তখন কাজ না পেলে শুনবেন কেন ?—সে কি মশায় শোনে কেউ ?...আমি সে রকম নই বাবু ! আমার কাজ যদি দেখেন,—ফি দিন দুচার পয়সা বক্‌সিস্ না দিয়ে থাকতেই পারবেন না। মুখের কথা বেরুতে না বেরুতেই আমি সেটা লুফে নিয়ে কাজ করি।

বাবা এতক্ষণ মুগ্ধ-বিস্ময় নিয়ে কেষ্টগোপালের অপূর্ব্ব বাক-পটুতার কারসাজি দেখছিলেন।

আমারও তপ্ত মেজাজটুকু ক্রমেই ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছিল, বললাম—তা মন্দ হবে না বাবা ! তোমার কেষ্টচন্দর এক ঢিলে দুটো-একটা নয়—পাঁচ-দশটা পাখী মেরে আনতে পারবে। কিন্তু টিক্‌লে হয়, যা চালাক !

বাবা ব'ললেন—চালাক না হ'য়ে বোকা হ'লেই বুঝি তোর আনন্দ হ'ত খুপি ?...ওরে কেষ্টলাল ! এক কাজ করিস্ বাবা ! তোর এই দিদিটির সাম্‌নে একদিনেই পেটের কথা খালি ক'য়ে ফেলিস্ নি।

আমি তাড়া দিলাম—যা করবে তা করবে, তুমি আর দেরী ক'রো না বাবা !—ভাত কটা যে মহাপ্রসাদ হ'য়ে উঠলো। কেষ্ট, যা তো ভাই ! বাবাকে তেল মাখিয়ে নাইয়ে নিয়ে আয় !

কেষ্ট তো মহা খুসী! 'ভাই' ব'লে সম্বোধন করাতে তার যে খুব আহ্লাদ হ'ল, তা চালচলনেই টের পেলাম।

...দুপুরবেলাটা কেষ্টগোপালকে নিয়ে আমাদের মন্দ কাটলো না। ছেলেটি সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কতকালের চেনা-জানার মত হ'য়ে পড়লো।...

বিকেলের দিকেও তাকে বিশ্রাম করতে দিলাম না। ঘর দোর সাজানো-গোছানো করতে করতে সন্ধ্যে হ'য়ে এল।

বাবা এতক্ষণ ঘরেই শুয়ে ছিলেন। শোয়া-বসা ছাড়া তাঁর তো দাঁড়াবার উপায় ছিল না কি না।...

ঘরে আলো জ্বালা হ'য়ে গেলে, কেষ্টকে ব'ললাম—উনুন ধরাতে পারবি রে?

কেষ্ট ব'ললে—খুব পারবো দিদি! অধিকিরী মশায়ের দলে আমার ও কাজটা একচেটে হ'য়েছিল। ব'লেই আর সে দাঁড়ালো না, রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেল।

আমি কলতলায় গা-ধুয়ে, জল তোলার পালা শেষ ক'রে, কাপড় ছাড়চি, বাইরে থেকে কে একজন ডাকলে—রামলোচন বাবু আছেন না কি?

বাবা ঘর থেকে হাঁকলেন—কেষ্টগোপাল!

কয়লামাখা কালি হাতখানা পরনের কাপড়ে মুছতে মুছতে কেষ্টগোপাল রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ব'ললে—আজ্ঞে—

বাবা ব'ললেন—আমাকে বাইরে নিয়ে চল তো বাবা! বোধ হয় সেই বাবুটি ডাকছেন।

তখন বাহির থেকে আবার সাড়া এলো—আপনি ব্যস্ত হবেন না রামবাবু! আমি অপেক্ষা করছি।

কেষ্টগোপাল আর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো না।—একটা কথাও আর আমাকে বা বাবাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে, তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে, আগন্তুক ভদ্রলোককে সম্বর্দ্ধনা করলে—আসুন আসুন! বাবু ডাকুছেন আপনাকে।

আমার যা রাগ হ'ল। কে না কে, কখনো দেখিনি, হঠাৎ তাকে বাড়ীর মধ্যে ডেকে আনা! ঠিক করলাম—কেষ্টকে এর জন্যে বেশ ক'রে শিক্ষা দিতে হবে।

আগন্তুক বাবুটি ততক্ষণে ভিতরে এসে গেছে।

আমি ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, বাবা ব'ললেন—আমাকে বাইরে নিয়ে চল তো স্থপি!

কিন্তু কেষ্টই বাবাকে বের ক'রে নিয়ে এসে, বাইরের ছোট রকটায় বসিয়ে দিলে।

কিন্তু লোকটা কি অসভ্য! বিনা অভ্যর্থনাতেই চট্ ক'রে বাবার পাশটি অধিকার ক'রে ব'সলো। তারপর আমার পানে চেয়ে ব'ললে—এইটি বুঝি আপনার মেয়ে?

কেষ্টা হতভাগা ঝাঁ ক'রে ব'লে উঠলো—আপনি বুঝি দিদিমণিকে দেখেন নি মোহনবাবু?—ভা-রি ভাল। আমাকে খুব ভালো বাসেন।

বুঝ্‌লাম—ভদ্র মহোদয়ের নাম মোহনলাল—না হয় মোহনচূড়া কিম্বা মোহনচন্দ্র। আমার কিন্তু তাকে একটুও ভাল লাগছিল না।

বাবা ব'ললেন—মেয়েটাকে খুব ভাল রকম ক'রেই শিক্ষিত করবো

ভেবেছিলাম,—কিন্তু তা আর হ'য়ে উঠ্‌লো না মোহনবাবু!...আশাই করে মানুষ,—কিন্তু আশা কি আর সব মেটে!

মোহনবাবু আমার পানে চেয়ে অত্যন্ত বেহায়া লজ্জাহীনের মত ব'লে উঠলো—দেখে তো মনে হচ্ছে খুব বুদ্ধিমতী। কিন্তু বাধা কি রামবাবু?...বেশ তো উনি মন দিয়ে পড়াশুনো করুন না।

বাবা ম্লান হাসি হেসে ব'ললেন—আর পড়াশুনো! ঘর সংসার নিয়েই মা আমার ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে প'ড়ছে। নইলে—আর বছর দুই পড়তে পারলেই ম্যাট্রিকটা দেওয়া হ'ত।

মোহনবাবু যেন আকাশ থেকে একরাশ নক্ষত্রকে অথবা চাঁদটা-কেই মর্ত্ত্যের বুকে আছাড় খেয়ে পড়তে দেখলে!—এত বিস্ময়! ব'ললে—সে কি মশায়! ইনি ম্যাট্রিক পড়তেন? কিন্তু কি আশ্চর্য্য রামলোচনবাবু! ওঁর চাল চলন কিম্বা ভাব ভঙ্গীতে এতটুকু টের পাওয়া যায় না যে,—ইস্কুলে পড়া মেয়ে!...লজ্জায় যে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যায়, সে যে ইংরজী লেখাপড়া শিখেচে,—এ আমি মোটেই বিশ্বাস করতে রাজী ছিলাম না, কিন্তু আপনার মুখ থেকে যা শুনছি, তা অবিশ্বাস করবো কি ক'রে!...বা! বা!—ভা-রি সুন্দর তো!

আমার ইচ্ছা হচ্ছিল—লোকটার কান দুটো আচ্ছা করে ম'লে দিই। ওঃ—ন্যাকাপনা করবার আর জায়গা পেলেন না! লজ্জায় আমি মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছি! আর চুপ করে থাকাটা সহ্য হ'ল না। কেষ্টকে ব'ললাম—বাজারে যেতে হবে কেষ্ট!

কেষ্ট আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে ব'ললে—কেন পান আনতে? কিন্তু ওবেলায় যে এক গোছ পান নিয়ে এসেচি দিদি!

দাওনা মোহনবাবুকে !...উনি আবার জরদা দেওয়া না হ'লে পান মুখে দেন না। কিন্তু তা তো আমাদের ঘরে নেই !—আছে দিদিমনি ?

আমার মনে হ'ল—রাগের চোটে হয়তো আমি দম্ বন্ধ হ'য়ে ফেটে চৌচির হ'য়ে যাবো !...নির্ব্বংশের বেটা কেষ্টা ছোঁড়া বলে কি !—আমি ঐ মোহনবাবুকে আদর-আপ্যায়ন দেখাবার জন্যেই বুঝি ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে—ওকে বাজারে পাঠাবার মতলব ক'রেছি !—ওঃ আবার পান দিতে হবে ! তা আবার দোক্তা-জরদা সমেত !...ব'ললাম—পান আনার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবেনা কেষ্ট ! তোমার অন্য কাজ আছে। যাও বাজার থেকে একগাছা মোটা দেখে ঝাঁটা কিনে নিয়ে এসো। ওবেলায় যেটা আনা হ'য়েচে, সেটা বেজায় সরু আর ছোট। কথাটা ব'লেই একবার আড়চোখে মোহনবাবুর মুখখানার পানে চেয়ে নিলাম। হাজার হোক্ ভদ্রলোক তো !—পান দেওয়ার প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে ঝাঁটা খরিদের ফর্দ্দ পেশ করা হয়তো ঠিক হ'ল না আমার। কিন্তু এ কথাটাও তো অস্বীকার করতে পারবো না যে, আমি ইচ্ছা ক'রেই ঝাঁটার কথা তুলেচি।

কেষ্ট—সম্ভবতঃ বাজারে যাওয়ার জন্যে তৈরী হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

বাবা ব'ললেন—ঝাঁটা পরে হবে স্থপি !—আগে দোক্তা না হয় জরদা কিনতে পাঠিয়ে দাও। যে জরদা দোক্তা দিয়ে পান খায়, তার পান খাওয়াটাও খুব ঘন ঘন চলে।...মোহনবাবু অনেকক্ষণ এসেচেন।

আমার রাগটা আর দেবে রাখা চ'ললো না। কিন্তু তবু গম্ভীর হ'য়ে ব'ললাম—ঘন ঘন চালায় যারা, তারাও জিনিসটা সঙ্গে সঙ্গেই

রেখে দেয় বাবা !...তোমার মোহনবাবুর পকেটে নিশ্চয়ই পানের ডিবে আছে। অবশ্য এতকথা ব'লতে আমার লজ্জা হচ্ছিল। কিন্তু তবু ব'ললাম।...বাবার ওপর আর কেষ্টার ওপর রেগে, আমার সারা দেহখানা রি-রি করছিল।

মোহনবাবু আমার কথা শুনে ভয়ানক জোরে হেসে উঠ্‌লো। তারপর পকেট থেকে সত্যি সত্যিই একটা ডিবে বের ক'রে, আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ব'ললে—আপনি যা ব'লেছেন,—তা একবর্ণও মিথ্যে নয়। কিন্তু বাড়ী থেকে বেরিয়েছি—প্রায় দু ঘণ্টা হবে। টিক্ খালি হ'য়ে গেছে।...তবে জর্দার অভাব হবে না। আপনি শুধু দয়া ক'রে খিলি কতক পান এনে দিন।

আমি তখনও আপন জায়গাটুকু ছেড়ে একচুল নড়ি নি। দেখি—কেষ্টচন্দর অতি অনুগত দীনহীন সেবকের ন্যায় ডিবেটা তুলে নিয়ে ঘরে ঢুক্‌লো !...উঃ...স্পর্দ্ধা !—মনিব যেন এই মোহনবাবুই !

আমরা শুধু তার অভাব অভিযোগটাই দেখে মরবো, সেবা পাবেন—স্বয়ং মোহনবাবু !

বাবা ব'ললেন—আর দেরী করিস নি মা !—ও কি আর পান সাজ্‌তে জানে ? শেষকালে চুণ বেশী দিয়ে, মোহনবাবুর গাল দুটোর দফা রফা ক'রে ছাড়বে।...যা যা !

...পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করি কেমন করে !...পান সেজে নিয়ে এলাম।

ডিবেটা ভরতি করে দিয়েছি। মোহনবাবু মুচকি হাসির জাল বুনছিল। ব'ললে—আপনাকে বহু বহু ধন্যবাদ !...কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য রামলোচনবাবু ! এখনও আপনার কন্যাটির নাম জান্‌তে পাইনি।

ব'লেই—আমার পানে চেয়ে ব'ললে—যদি কিছু মনে না করেন—

আমি ব'ললাম—শ্রীসুপ্রিয়া দেবী আমার নাম।...তারপর বাবাকে ব'ললাম—তোমরা একটুখানি বাইরে ব'সো গে বাবা!... উনুনটায় বড় ধোঁয়া হচ্ছে।...যা তো কেষ্ট! বাবাকে বাইরে দিয়ে আয়!...দরজার পাশের রকটায় ব'সে ব'সে বেশ গল্প হবে ওঁদের।

কিন্তু কেষ্টকে এক পাও অগ্রসর হ'তে হ'ল না।

মোহনবাবুই সাতজন্মকার আত্মীয়ের আসন দখল করে নিয়ে,বাবার দু'হাত ধরে, খুব সন্তর্পণে তাঁকে বাইরের রকে এনে বসিয়ে দিলে। বা বা—লাগ্‌ ভেল্কী লাগ্‌!—আচ্ছা যাদু জানে তো দেখছি—এই মোহনলাল!

আমি বাহির-দরজাটা ভেজিয়ে দেব ভেবে এগিয়ে যাচ্ছি,—মোহনবাবু ভেতরে ঢুকে ব'ললে—খুব অল্প করে একটুখানি চূণ দরকার।—কিন্তু আপনি যা পান সাজেন,—beautiful! কখ্‌খনো খাই নি এমন।...

আমি বাক্যব্যয় করলাম না। রান্নাঘরে ঢুকতে ঢুকতে কেষ্টকে আদেশ করলাম—চূণ দে কেষ্ট!

কিন্তু একটা কথা জানবার জন্যে আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে এই অত্যন্ত অপছন্দ করা লোকটির সঙ্গেও কথা বলতে হ'ল। জিজ্ঞাসা করলাম—আমাদের কেষ্টকে আপনি চিনলেন কেমন করে?

মোহনবাবু হেসে বললে—কেমন ক'রে চিন্‌লাম?...হুঁঃ—বলি—অমন কম্‌পিটান্ট সার্‌ভেণ্ট—পেলেন কোত্থেকে মশায়! এই হত-

ভাগা মোহনই যোগাড় ক'রে দিয়েছে।...ব্যাটা কিছুদিন থেকে আমার বাড়ীতেই ছিল কিনা!...ওর এক দাদা আমার ওখানে চাকরি করে। ...কিন্তু কেষ্টর আসল গুণটুকু বুঝি এখনো টের পান নি?

আমি জিজ্ঞাসু হ'য়ে চাইতেই, মোহনবাবু বল্লে—ফার্ষ্ট ক্লাস গায়!...ব্যাটা বছর দুই ধ'রে একটা যাত্রার দলে গান করে বেড়াতো। গলাটা অবিকল কোকিল-কণ্ঠ।

* কেষ্ট তখন রান্নাঘরের সুমুখে দাঁড়িয়ে—উনুন ধরলো কিনা তার তদারক করছে। একবার তার পানে সপ্রশংস দৃষ্টি মেলে আমি বললাম—ভালই হ'ল, বাবার মনটা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ষোল-সতের ঘণ্টাই অস্থির হয়ে থাকে। তবু ছোঁড়াটার মুখে ভাল ভাল গান শুনলে উপকার হবে।

কেষ্ট কিন্তু আমার কাণের কাছে মুখ এনে আস্তে বলার কায়দা বজায় রেখে, এতই জোরে ব'ললে যে, বোধ করি বাইরে ব'সে থাকতে থাকতে বাবাও তা শুনতে পেলেন। ব'ললে—মোহনবাবুর খুব বড় আর ভা-রি মিষ্টি আওয়াজের একটা হারমোনিয়াম আছে দিদিমণি!—সেটা পেলে—

মোহনবাবু কেষ্টর কথা শুনে অন্য কিছু ব'ললে না, খালি একবার হাসলে। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা—

—বলুন না!

—আপনি কোন্ ইস্কুলে পড়তেন?

—বউবাজার—ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশানে।...কিন্তু হঠাৎ একথা

জান্‌তে চাইলেন যে ?

—আপনি গাইতে জানেন কি না, তাই—

আমি কথা কইলাম না। লোকটার নির্লজ্জ ব্যবহারের মাত্রা যেন ক্রমেই বৃদ্ধির পথ ধ'রেচে !

সে কিন্তু চুপ করে রইলো না। ব'ললে—জানেন—না ?

আমি ব'ললাম—কিন্তু আর আমি গান গাইবো না।...তারপর কেষ্টকে বললাম—বাজারে যাবি, না যাবি নে ?—রাত হয়েচে দেখছিস ?

মোহনবাবু কিন্তু বাইরে চ'লে গেল।

আমি বিস্মিত হ'য়ে উঠ্‌লেও, স্বস্তি অনুভব করলাম। কি জানি কেন প্রথম দেখা থেকে এতক্ষণ অবধি এই অতি যত্নে বাবু সাজা লোকটিকে আমার একটুও ভাল বলে মনে হচ্ছিল না।......

ভেতর থেকেই কথাবার্ত্তার আওয়াজ কাণে আসছিল। বুঝতে পারলাম—বাবার সঙ্গে এই বাবুটির ভয়ানক আলাপ জমে উঠেচে !...

...কিন্তু কী আশ্চর্য্য !—বাবার বয়সে আর মোহনবাবুর বয়সে না হবে—পঁচিশ বছরের তফাৎ !

বাবা বলছিলেন—গত মাঘমাসে তিনি উনপঞ্চাশ বছর পার হ'য়েচেন।

—

*   *   *   *

এইরকম ভাবে দিন পাঁচ সাত যাতায়াত এবং আলাপ পরিচয়ের ফলে, মোহনবাবুর সঙ্গে আমার বাবার ভয়ানক বন্ধুত্ব হ'য়ে উঠলো।...এমনকি একদিন আমি দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম—মোহনবাবু সিগারেট খেয়ে; সেই পোড়া আধখানা সিগারেটটই বাবাকে টান্‌বার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে !...ছি—ছি—দোষ আজ কাকে দেব, বাবাকে না এই মোহনবাবুকে !...

ক'দিন থেকে আর একটা নতুন ধরণের জল্পনা-কল্পনা হচ্ছিল।—

সেটা—আমার বিয়ের কথা।

বাবা গোড়ায় গোড়ায় আমাকে কোন কথাই জানান নি।, অথচ আমি লেখাপড়া জানা মেয়ে, বয়স্কা,—ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঙ্গে দস্তুর মত লড়াই করতে শিখেচি।

একদিন রাতের বেলায় খেতে ব'সে, বাবা বললেন—ছেলেটি অত্যন্ত ভদ্র। এই আলুর বেপারী আর রিক্‌সাটানা কুলী-বস্তির ভেতর এসে, নিশ্চয়ই হাঁপিয়ে পড়তাম—যদি না তার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা জন্মতো। দেখলে গা জুড়িয়ে যায়।...পাড়ার রত্ন !

আমি অনুমানে বুঝতে পারলাম—রত্নটি কে, তবু জিজ্ঞাসা করলাম—কার কথা ব'লছো বাবা ?

বাবার মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। জবাব দিলেন—আমাদের মোহনবাবু রে !...ফার্ষ্ট ক্লাস জেণ্টলম্যান। হাজার হোক

সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে !

—ও হরি! এর ভেতর বংশ-গোত্রাদিরও পরিচয় নেওয়া হ'য়ে গেছে !

আমার চিন্তা হ'ল।...কোন কিছু না বল্‌তেই বাবা আপনা আপনি ব'লতে সুরু করলেন—ভাবনার কথা মোটেই ছিল না। যা পেয়েছিলাম কপালে থাক্‌লে আজ আমার সুখের অবধি থাক্‌তো না। কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ !...ভাগ্যে আছে অনুসন্ধানের বিড়ম্বনা।

আমি কথার ভাবার্থ বুঝেও বুঝতে পারলাম না। প্রশ্ন করলাম—মোহনবাবুর পূরো নামটা কি বাবা ?

বাবা বিমর্ষ হ'য়ে ব'ললেন—ঐখানেই যত দুঃখ মা! নাম তার মোহনলাল চক্রবর্ত্তী। বামুন হ'য়েই গোল বাধিয়েছে। নইলে তাকে ঘরের ছেলে ক'রে নিতে এখনো আমি দেরী করি!...বামুন-কায়েতের মধ্যে বিয়েটা যে সমাজে চলে না।

ভগবানকে উদ্দেশে কোটী কোটী প্রণাম জানিয়ে মনে মনে বললাম—এইজন্যেই লোকে তোমায় অন্তর্যামী বলে প্রভু!—অন্তরের ব্যথার কথা এত বড় মন দিয়ে আর তো কেউ জান্‌তে চায় না, জান্‌তে পারেও না।

প্রকাশ্যে কোন কথাই বলছি না দেখে, বাবা বল্‌লেন—সামান্য বংশের ছেলের হাতে তো তোমায় দিতে পারবো না মা! নইলে—মোহনদের মেসেই একটি সুপাত্র ছিল। দেড়শো টাকা মাইনে পায়। দেশে জমী-জায়গা আছে...বলতে বলতেই মোহনের প্রতি একটা স্নেহসূচক তিরস্কার জানিয়ে দিতে ব'ললেন—ছেলেটার জ্ঞান-গম্যি

একটুও নেই। বুদ্ধিমান হ'লে কি হবে, বয়স তো পাকে নি আর!—বলে—আপনি যুদ্ধ করতে গেলেন, এতকাল ক'লকাতায় বাস ক'রে আসচেন—তবু বংশ-গোত্র নিয়ে মারামারির বালাই ঘুচ্‌লো না!—হা হা—তা কি ঘোচে!—ওটা যে হিন্দুদের মজ্জাগত রোগ!...নাঃ—ও দেড়শো ছেড়ে তিনশো টাকার চাকরী করুক—ওর সাথে হ'তেই পারে না।

আমি এতক্ষণ মুখ নীচু করে শুনে যাচ্ছিলাম। এইবার বলে ব'ললাম—আচ্ছা বাবা!—এই খোঁড়া হাত পা নিয়ে, শেষ বয়সে আরও কত দুর্গতি তুমি মাথা পেতে নিতে চাও? আমাকে তাড়ায়ে তোমার কপালে বুঝি সুখের পালা দ্বিগুণ হ'য়ে সুরু হবে?

বাবা হাসতে হাসতে ব'ললেন—দ্বিগুণ বলিস নি সুপি! বল্—লক্ষ গুণ—কোটী কোটী গুণ!...মেয়ে-জামাই নিয়ে সংসার যাত্রার সুখ, সে যে কেমন, তা যখনই কল্পনায় ছবি আঁকি—তখনি আমার সারা দেহটা আনন্দে শিউরে ওঠে! কিন্তু তা যে হবার নয় রে! তা হবার নয়। পঙ্গু, খোঁড়া, বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী-হারানো অদৃষ্ট নিয়ে সে সুখের মুখ দেখা কি আমার সহ্য হবে? তা হবে না।

একেই বলে—স্নেহাধিক্য!...অথচ বাবা বোঝেন না যে, জামাতৃ-পদবাচ্য লোকটির মনে তাঁর প্রতি সহানুভূতির কণামাত্রও যদি না থাকে, তা হ'লে এই বয়সে তিনি কোথায় দাঁড়াবেন! সুপাত্র পেয়ে তারই হাতে সর্ব্বস্ব,—আমি পর্য্যন্ত যদি সমর্পিত হ'য়ে যাই, তাহ'লে তাঁর গতি কি হবে। অথচ খেয়াল চেপেছে, ক্ষান্ত করবারও পথ পাই না। জানি—চিরকালই জেদের আসনকে তিনি শ্রেষ্ঠ জায়গা

ছেড়ে দিয়ে এসেচেন। নইলে—বিবাহযোগ্যা কন্যা, সহায়হীনা পত্নী—সর্ব্বস্বর মমতা ভুলে লড়াই করবার ঝোঁক্ চাপে!

কথা কাটাকাটি অনেকদিন ক'রেছি, আজও অনেকক্ষণ করলাম—কিন্তু বাবার ধনুকভাঙা পণ—তিনি অটল!......

...পরের দিন......

ভোর বেলাতেইমোহনবাবু এসে ডাকাডাকি সুরু ক'রেছে।

আমি তখন সবে বিছানা ছেড়ে, ঘরে-দোরে জল দিচ্ছি।

কেষ্ট আজ ক'দিন থেকে তার কোন্ দূরসম্পর্কের মাসী না পিসীর অসুখ করেছে বলে রাত্রিতে বাড়ী থাকে না। রোগীকে দেখবার লোক-জন নেই, তাই রাতের বেলায় তাকে আগ্‌লাতে যায়। কাল রাত্রিতেও গেছে—এখনও ফিরে আসে নি।

ওদিকে বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধুটি ডেকে ডেকে গলা ফাটিয়ে ফেল্‌চেন।

একবার ভাবলাম—বাবাকে ডেকে দিই, কিন্তু জানি—কাল সমস্ত রাত্রিটাই তিনি এপাশ ওপাশ করে অনিদ্রায় কাটিয়েছেন। ভোরের ঘুম ভাঙিয়ে দিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হল না।

সাড়া দিলাম—বাবা ঘুমুচ্ছেন।

বাহির থেকে মোহনবাবু ব'ললে—এখনো ঘুমুচ্ছেন! কিন্তু আমার যে ভয়ানক একটা জরুরী দরকার ছিল।

আমি দরজা না খুলেই, ভিতর থেকে বললাম—ঘণ্টা খানেক ঘুরে আসুন না। কাল সারারাতটাই বাবা জেগে কাটিয়েছেন। একটুও ঘুম হয় নি। সেইজন্যে জাগিয়ে দিতে সাহস পাচ্ছি না।

—আচ্ছা, তুমি দরজাটা খোল দেখি—

উপায় নেই। একান্ত অনিচ্ছায় দরজা খুলে দিলাম। বাড়ীর মধ্যে ঢুকেই, বাবু আমাকে কৃতকৃতার্থ ক'রে দিলেন!

—আজ সর্ব্বপ্রথম তোমাকে 'তুমি' ব'লে ডেকেছি, সেজন্যে মার্জ্জনা ক'রো। কিন্তু তার আগে কৈফিয়ৎটাই পেশ ক'রে রাখি—

কাল রামবাবু ব'লে ব'সলেন—সুপিকে তুমি 'আপনি-আজ্ঞে' কর কেন? ওতে 'পর' ভাবা হয়। এই কারণেই—

আমি ব'ললাম—একটুও কৈফিয়তের দাবী করি নি আমি, মিছি মিছি কেন বাজে ব'কছেন? তারপর নিজের যা কাজ ছিল তাতেই মনোযোগ দিতে যাচ্ছি, মোহনবাবু বললে—সে ব্যাটা কই? কেষ্টা?

—মাসীর বাড়ী গেছে।

—এখনো যাচ্ছে নাকি?

—হ্যাঁ।

—আসে কখন?

—আজকে দেরী হচ্ছে, অন্যদিন এতক্ষণ এসে পড়ে।

—কখন যায়?

—রাত দশটায়।

—ফেরে ক'টায়?

—ছ'টায়-সাড়ে পাঁচটায়।

—ব্যাটা রাস্কেল্!...আজ আচ্ছা ক'রে ধমকে দিয়ো। চাকরী করতে এসে ওরকম নবাবী চ'লবে না। ওঃ ব্যাটা যেন লাটসাহেব হ'য়ে গেছে। সাতটা-আটটায় চাকরী করতে আসবেন!

আমি চুপ ক'রে থাকলাম। অথচ রাজ্যের কাজ বাকী প'ড়ে র'য়েচে, সে গুলো শেষ করবারও ফুরসৎ পাচ্ছি না।

মোহনবাবু ব'ললে—সমস্ত রাত্রিটা জেগে কাটিয়েছেন? কিন্তু কেন বল দেখি? অসুখ বিসুখ কিছু করে নি তো?

আমি ব'ললাম—না অসুখ করে নি। বাবার মাঝে মাঝে এমনিতর হয়। যেদিন রাত্রিতে ঘুম না হয়, তার পরের দিন অনেকখানি বেলায় ঘুম ভাঙে।

—তা তো ভাঙে সুপ্রিয়া! কিন্তু আমি যে ভয়ানক মুস্কিলে পড়লাম। এমন একটা জরুরী কথা আছে, যা এখনি না জানালে চ'লবে না।

আমি বললাম—খানিকটুকু অপেক্ষা করলে চ'লবে না?

—চ'লতো।...কিন্তু আমার যে আর দেরী করার সময় নেই সুপ্রিয়া!...ছেলেছুটোর একজামিন এসে পড়েছে, একটু বেশী ক'রে না খাট্‌লে বোধ হয় স্কলারশিপ বাদ পড়বে।

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম।

বাবা বলেন—মোহন ধনীর সন্তান। ...ধনীর সন্তান হ'লে ছেলে-পড়ানোর ঝোঁক্ কেন?—জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি বুঝি টিউসনি করেন?

ঈষৎ হেসে মোহনবাবু ব'ললে—হ্যাঁ, টিউসনি করি বটে, কিন্তু টিউসনির নিয়মটা মোটেই মেনে চলি নে।

—কি রকম?

—অনারারি পোষ্ট।—বিনা বেতনে ছবেলায় ঘণ্টা দুই পড়াই।

গরীব ছেলে,—অথচ nice brain ! ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ না নিয়ে ছাড়বে না—এই পণ করেছে। নইলে তোমাদের পাঁচজনকার আশীর্ব্বাদে দশ বিশ পঞ্চাশ টাকা আমাকে গতর খাটিয়ে যোগাড় করতে হয় না।...বাবার যা জমীদারী আছে, আমি তো আমি, আমার পরবর্ত্তী দু তিন পুরুষ নির্ভাবনায় কাটিয়ে দেবে।...

উনিশটাকা দিয়ে একটা ঘড়ি কিনেছিলাম। ঠং ঠং ক'রে সাতটা বেজে গেল !

কেষ্টা হতচ্ছাড়ার এখনো দেখা নেই !

মোহনবাবু আবোল-তাবোল অনেক কথাই ব'লে যাচ্ছিল। আমার কিন্তু তত কথা শোন্‌বার আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ কিছুই ছিল না।

ঘর থেকে আলস্য-জড়িতস্বরে বাবা ডাক্ দিলেন—কেষ্টা !

আমি যেতে না যেতেই, মোহনবাবু তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুক্‌লো। আমিও তার পেছনে পেছনে ঢুক্‌লাম। কিন্তু আমাকে যেতে দেখেই, বললে—তোমার বাসী কাজগুলো সেরে ফেলো সুপ্রিয়া !—কেষ্টা বেটা যদি নাই আসে, তাহ'লে কষ্টের সীমা থাকবে না। রামবাবুরও খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম হবে।...ওঁর মুখ হাত ধোয়ার জল-টল যা দিতে হয়, সে আমিই দিচ্ছি।

বিস্মিত হ'য়ে উঠ্‌লাম।—বাবা মিথ্যে বলেন না তাহলে,...সত্যিই পাড়ার রত্ন ! ব'ললাম—সেকি—আপনি কেন কষ্ট করবেন ? ভারি তো কাজ, আমি একটুও অসুবিধেয় পড়বো না। আপনি বরং এই চৌকিটায় বসুন। তারপর বাবাকে ব'ললাম—মোহনবাবুর হঠাৎ কি

জরুরী কাজ প'ড়েছে বাবা! ঘণ্টা খানেক ধরে উনি ধন্না দিয়ে র'য়েচেন।

দেখ্‌লাম—বাবা রীতিমত ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। তাড়াতাড়ি উঠে, মোহনবাবুর কাছে ব'সে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার কি মোহন? কাল তো আমায় কিছু বল নি।

জরুরী প্রয়োজন যে কি, সেটুকু জানবার জন্য আমি যারপর নাই অধীর হ'য়ে উঠেছিলাম। কিন্তু তবু ঘরের মধ্যে আর এক মিনিটও অপেক্ষা করলাম না। মতলব রইলো—কাজের অছিলায় ঘুরতে ঘুরতে দুজনের অজ্ঞাতে আমার জ্ঞাতব্যটুকু জেনে নেব।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম কিন্তু কাণ দুটো আমার ভয়ঙ্কর সজাগ হ'য়ে রইলো।

শুন্‌তে পেলাম—মোহনবাবু ব'লছে—আমি দশটার মধ্যেই বাড়ীতে টেলিগ্রাফ্ ক'রে দেব। সন্ধ্যা নাগাদ একান্ত না আসে, কাল দশটা এগোরটায় নিশ্চয়ই এসে যাবে।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন—কত টাকা ঠিক চাই তোমার?

মোহনবাবু ব'ললে—আমার কাছে যা আছে সে যৎকিঞ্চিৎ,—শ' তিন হ'তে পারে।...মোট দেড় হাজারের কম হ'লে চ'লবে না।... আপনি বারো শ' টাকা দিন।

বাবার মুখ থেকে 'হঁ্যা না' কোন কথাই শুন্‌তে পেলাম না।

শুন্‌লাম মোহনবাবু ব'লছে—কিন্তু একটা কথা আপনাকে ব'লে রাখচি রামবাবু!—যদি এখনও অবিশ্বাসের ভাব আসে, তাহলে কদাচ দেবেন না।...আপনার আমার মধ্যে যে পবিত্র আত্মীয়তা গ'ড়ে

উঠেচে, এই তুচ্ছ কারণকে উপলক্ষ্য করে আমি সে আত্মীয়তা খর্ব্ব করতে চাইনে। যদি মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা অথবা অবিশ্বাস আসে, তাহলে কদাচ দেবেন না। আমি জানি, এ টাকা যদি আপনার কাছ থেকে আজ না নিতে পারি তাহলে মহা অনর্থপাত হ'য়ে যাবে। সমস্ত জীবনের সকল পুণ্যের বিনিময়েও আর সংশোধন হবে না,—তবু এত দায়ীত্ব জেনেও, আপনার অনিচ্ছার উপকার আমি কোন রকমেই নেব না। অবশ্য নিতাম—যদি না আজ আপনার আমার সম্বন্ধটা অসাধারণ হ'য়ে উঠতো।

বাবার উচ্চ হাসির শব্দ আমার কানে এল। আরও শুনতে পেলাম, বলছেন—বার্দ্ধক্যের সম্বল, কন্যা সুপ্রিয়ার ভবিষ্যৎ-জীবন নির্দ্দেশ করার একমাত্র উপকরণ,—যা কিছু আমার পুঁজি আছে—তোমার একটিমাত্র মুখের কথায়—সমস্ত এক্ষুনি বের করে দিতে পারি, এর জন্যে লম্বা চওড়া ভূমিকার একটুও প্রয়োজন নেই মোহন!...তারপরই ডাক্‌লেন—সুপ্রিয়া!

আমি ঘরে আস্‌তেই বল্‌লেন—কেষ্টা কোথায়?

বললাম—এখনো আসে নি।

মোহনবাবু বললে—আজ ব্যাটাকে জুতোপেটা ক'রে ছাড়বো। ব্যাটা যেন মুর্শিদকুলী খাঁ!

আমি আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে র'য়েচি দেখে, বাবা ব'ললেন—তুমি একা আর কতদিক সাম্‌লাবে মা! সে ব্যাটাই ফিরে আসুক্‌।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি করতে হবে বলো না?

বাবা ব'ললেন—ভোর থেকে ধন্না পেতেছিল ব'লবি, অথচ আমি

জানি,—আজ ওর চা খাওয়া হয় নি।...মোহনকে একটুখানি চা দিতে হ'ত মা!

মোহনবাবু ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে ব'লে উঠলেন—না না কিচ্ছু দরকার নেই। আমার মোটেই দেরী করা চ'লবে না।

আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম।

তখন জমীদার-বংশধর, তিনপুরুষ নির্ভাবনায় কাটিয়ে দেওয়ার ভলান্‌টিয়ার মোহনবাবু আমার বাবার কাছে সাম্বনয়ে জানাচ্ছেন—আপনার এই দয়ার কথা আমার চিরকাল স্মরণ থাকবে রামবাবু!... মুখের কথা খুল্‌তে এই যে এতগুলো টাকা আপনি বের ক'রে দিলেন—

বাবা হেসে বললেন—এখনো দিই নি মোহন! তা ছাড়া দয়া জিনিষটা ঠিক এ রকম ভাবে যাচাই হয় না।

মোহনবাবু ব'ললে—কিন্তু আপনি তো জানেন না রামবাবু যে, এ টাকা আমি কেন চাচ্ছি। সেই জন্যেই আপনাকে দেবতা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে ইচ্ছে হয় না।...একজন গরীব ব্রাহ্মণকে কন্যাদায়ে সাহায্য করবো। কথা দিয়েছিলাম। আগামী কালই বিয়ের দিন। অথচ আজ দিন চার থেকে আমি ফি দিনই চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট ক'রে খরচা ক'রে এসেচি। কতকগুলো গরীব ছেলেদের এক্‌জামিনে ফি দেওয়ার টাকা ছিল না।...এ ছাড়া ঘোরাঘুরিতেও কম সময় যায় না। নানা ঝঞ্ঝাটে প'ড়ে হিসেব ঠিক রাখ্‌তে পারিনি।

বাবা ব'ললেন—দেখ্‌ তো স্থপি, ক্যাশবাক্সটা খোলা না বন্ধ?

শুন্‌লাম—মোহনবাবু ব'ললে—খোলা।

বাবা ব'ললেন—ওর ভেতর এক ছড়া চাবি আছে দাও !...

তারপর বোধ হয় আপন বাক্স খুলে মোহনবাবুকে দরকারী টাকাটা দিয়ে দিলেন, কেন না—মিনিট তিনেকের মধ্যেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

ঠিক এম্‌নি সময়ে কেষ্টচন্দর বাড়ী ঢুক্‌লেন।

আর যায় কোথা !—

মোহনবাবু ডান্ পায়ের 'পাম্ সু' জুতোটা খুলে, কেষ্টর মাথা থেকে পিঠ পর্য্যন্ত পিটিয়ে ছেড়ে দিলে।

কেষ্টার কিন্তু ভয়ানক সহ্য গুণ। এত মার, যা চোরকে মারলেও তার রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে,—কেষ্টচন্দর আমার কথাটি কইলে না ! একটিবার গায়ে-পিঠে হাত দিয়েও আঃ উঃ করলে না ! মিনিট চার পাঁচ চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে বাবাকে বাইরে আনবার জন্তে ঘরে ঢুক্‌লো।......

......রোজকার অভ্যাস মত আজও অপরাহ্ন-বেলায় মোহনবাবু বাবার কাছে বেড়াতে এলো। বাইরের যে রক্‌টায় ব'সে গল্প হ'তো কেষ্ট সেইখানটিতে বাবাকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়ে এলো।...

...ঠিক তখন সন্ধ্যা উতরে আস্‌চে।

বাবা ডেকে ব'ললেন—কেষ্ট ! শোন্ তো রে !

...এর পরে কি ঘটেচে না ঘটেচে আমি জান্‌তে পারি নি। প্রায় দশ মিনিট পরে, কেষ্ট একখানা খবরের কাগজ আর একখানা টেলিগ্রাফের খাম, বাইরের রক্ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ী ঢুক্‌লো।

জিজ্ঞাসা করলাম—ও সব কিরে ?

কেষ্ট বল্‌লে—মোহনবাবু আর আমাদের বাবু দুজনে রিক্সা চেপে বেরিয়ে গেলেন।...কাগজগুলো ওঁদের ওখানেই প'ড়ে ছিল।...

আমি টেলিগ্রাফটাই খুলে পড়লাম— লেখা আছে—

"আজ সময় হ'ল না। কাল তিন হাজার পাঠাচ্ছি।"

বুঝলাম—এটা মোহনবাবুর দেশ থেকে এসেচে। প্রায় তের চোদ্দটা অক্ষর জুড়ে যে গাঁ থানার নাম লেখা হয়েছিল—সেটা আমি বুঝে উঠতে পারলাম না।

...কিন্তু রিক্সা চেপে বাবাকে নিয়ে লোকটা গেল কোথায়!

---

* * *

অপেক্ষা করে করে ঘড়িতে যখন ন'টা বেজে গেল, তখন আস্তে আস্তে বাহিরের রকটায় একখানা সতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ক'দিন থেকে ক'লকাতা সহরের গরমটা ক্রমেই অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। আমাদের ছোট বাড়ী একতলা খোলার ঘর হ'লেও, আশে পাশে দোতলা চারতলার বালাই ছিল না ব'লে বাড়ীর ভেতর হাওয়া বইতো। সামান্যক্ষণ শুয়ে থাকৃতে থাকৃতেই আমার তন্দ্রাভাব এসে পড়লো।

মোহনবাবুকে ঠিক অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করবার মত মানসিক শক্তি আমি কোনরকমেই লাভ করতে পারি নি। কিন্তু তাই বলে সে পাশে থাকৃলে আমার বাবার যে কদাচ বিপদ ঘটবে না, এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার তখনো অক্ষয় হয়ে রয়েচে। সেই জন্যেই বাবার ফিরে আসতে দেরী হচ্ছে দেখেও আমি চিন্তিত হলাম না।

বাইরের যে রকটায় ব'সে বাবা মোহনবাবুর সঙ্গে গল্প গুজব করেন, কেষ্ট সেই রকটায় শুয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। মাসীর বাড়ী যাওয়ার কথাও বোধ হয় হতভাগার আজ মনে নেই।

ঘুমের আমেজ আসতেই, আমি সদর দরজাটা বন্ধ করার আবশ্যক বুঝলাম। কেষ্টকে নাম ধরে বার কতক ডাকৃতেই সে উঠে এলো। বললাম—ঘুম পাচ্চে, তুই সদর দোরটা বন্দ করে আয়।...কিন্তু আজ বুঝি তোকে যেতে হবে না কেষ্ট?...মাসী সেরে গেছে?

কেষ্ট অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে মাথা হেঁট করলে। বুঝলাম—বেচারীর মনের অবস্থা একটুও ভাল নয়। জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন আছে রে —তোর মাসী ?

কেষ্ট কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে—একটুও ভাল না। কাল সারা রাত জেগে কাটাতে হয়েছিল, সেই জন্যেই আজ ভোরে আসতে পারি নি। ...আমি যখন আসি তখন জ্ঞান ছিল না।

আমার রাগ হ'ল যেমন, দুঃখও হ'ল তেমনি। হতভাগা মূর্খ, এমন সাংঘাতিক অবস্থা নিজের চোখে দেখে এসেও, এতখানি নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েচে ! কিন্তু পরাধীন ভৃত্য,...মনিবের হুকুম না পেলে সে যায় কেমন করে। বললাম—আর দেরী করিস্ নি কেষ্ট !—খেতে বো'স্।

কেষ্টর সেই বিমর্ষ ভাব। বললে—বাবু ফিরে আসুক।

আমি বললাম—বাবু কখন ফিরবে তার ঠিক কি ? তুই খেয়ে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়।...হ্যাঁরে তুই এমন বোকা ? অজ্ঞান হয়ে আছে দেখে এলি, তবু এখনো যাওয়ার নাম করছিস্ নি ! নে নে ওঠ্ শীগ্‌গীর।

কিন্তু সে উঠলো না। সেই যে গুম্ হয়ে দাওয়ার কোণ ঘেষে ব'সে পড়েছে, সেখান থেকে তাকে নড়ায় কার সাধ্য !

আমার বিস্তর ডাকাডাকিতে, বললে—ও বেলাকার জুতো পেটার ব্যথা আমার এখনো দগ্ দগ্ করছে, এর ওপর আর সইতে পারবো না। বাবুর ফিরতে যত রাতই হোক্, আমি বাইরের রকে জেগে থাকবো। বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে, সদর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে

সত্যসত্যই রকে গিয়ে বসলো। আমার ডাকাডাকিকে একটুও গ্রাহ্য করলে না। কেবল বাহির থেকে চীৎকার করে বললে—তুমি ঘুমিয়ে পড়ো দিদি! আমি ঠায় ব'সে রইলাম।

একটা অতি গণ্ডমূর্খ বালক ভৃত্যেরও যে মানসিক জেদ্ এত প্রবল হয়ে উঠতে পারে সে আজ এই প্রথম বুঝলাম। অনুরোধ-উপরোধের সীমা যখন ছাড়িয়ে গেল—তখন আর কথা কইলাম না।

নীরবে পড়ে থাক্‌তে থাক্‌তে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জেগে উঠে দেখি, বাবা আর মোহনবাবু আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে!…বোধ হয় আমাকে ডাকাডাকি করছিলেন।

আমি গায়ে মাথার কাপড় গুছিয়ে নিয়ে, উঠ্‌তে উঠ্‌তে ডাক্‌-লাম—কেষ্ট!

বাবা বললেন—চোখে মুখে জল দিয়ে আয় স্থপি! এখনো তোর ঘোর কাটে নি।…কেষ্টা বুঝি এত রাত অবধি তোর বাড়ীতে কোন দিন থাকে?…যার নাম কেষ্টবাবু!…সে তো কখন তার মাসীর বাড়ী চলে গেছে।

আমি বললাম—কিছুতেই বাড়ী যেতে চায় না দেখে আমিই ইচ্ছে করে তাকে পাঠাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে ও বেলার মোহন-বাবুর জুতোমারার কথা জানিয়ে বললে—'আমার আর সহ্য করবার ক্ষমতা নেই। স্থতরাং এর পর আর মার ধোর করলে বরদাস্ত করতে পারবো না।'…এই কথা শেষ হলে, আমি ঘুমিয়ে পড়ি।…

…কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বার আগে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—কেষ্টা যেমন বিশ্বাসী তেমনি চালাক চতুর। তার কথাবার্ত্তাও দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

ও হরি! এই বুঝি দৃঢ়তা!···যাবো না বলেও, আমাকে না জানিয়ে চ'লে গেছে!

আমাকে নীরব হয়ে চিন্তা করতে দেখে, বাবা বললেন—তোর হ'ল কি রে সুপি? খালি ভাবচিস যে?

বললাম—ভাবনার কথাই যে বাবা! না ভেবে থাকি কেমন করে?...দোর খোলা হাঁ হাঁ করছে, সে ছুঁচোটা যাবার সময় কেন আমাকে জাগিয়ে দিয়ে গেল না।

মোহনবাবুও আমার কথাতেই সায় দিয়ে, ব'ললে—নিশ্চয়ই তার বলে যাওয়া উচিত ছিল। এরকম ধারা চাকর নিয়ে কোন রকমেই বাস করা নিরাপদ নয়।

আমার প্রথমটা খুব রাগ হ'ল। তারপর ঈষৎ হাসির সঙ্গে বললাম—বাস করা যে নিরাপদ নয়, এটা যখন আপনি বেশ ভাল করেই জান্‌তেন মোহনবাবু! তখন জেনে শুনেও অমন অবিশ্বাসী চাকরকে কেন জুটিয়ে দিয়েছিলেন? আগে একশোটা মুখ বের করে যার গুণ গেয়ে এসেচেন, এখন একটা মুখ দিয়ে এতটুকু দোষ গাইলেও যে তা অত্যন্ত খাপ ছাড়া ঠেক্‌বে তাকি আপনি বোঝেন না?...

বেশ দেখলাম—মোহনবাবুর মুখখানার চেহারা অন্য রকম হ'য়ে গেল, কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্য। ব'ললে—অস্বাভাবিক বলে আমরা যাকে ধরে রাখি, সে ও স্বাভাবিক সুপ্রিয়া! কারণ সে যখন ধরা দেয়, তখন অস্বাভাবিক হয়েই দেয়। ঐ তার ধর্ম। আমি কি জানতাম যে, কেষ্টার মত চাকর এমনি বেহেড্‌ হ'তে পারে? যাকে আজ দশবছর ধরে দেখে আসচি···

আমি আর কথা কাটাকাটি পছন্দ করলাম না। বাবাও এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এতক্ষণে বললেন—মোহনকে তুই মিথ্যে দোষী করছিস্ মা! বুঝতে পারলে কি আর মানুষের ভুল হয় কখনো? ...তা ছাড়া এমন কি গুরুতর দোষ করে গেল কেষ্ট,যে তারই জন্যে ঘণ্টা খানেক ধরে আলোচনা চালাতে হবে?...মাসীর অসুখ, মন ভাল নেই—

আমি কারো কথা না শুনে. সোজা ঘরে ঢুকলাম, তার পর যে বাক্সটায় আমাদের যথাসর্ব্বস্ব রাখা ছিল সেই বাক্সটা খুলবার জন্যে চাবি লাগাতেই দেখি খোলা! তারপর—

হা হতোস্মি!...

সব ফাঁক! সর্ব্বস্ব গেছে আমাদের! কেষ্টচন্দর আমাদের পথে বসিয়ে রেখে, আপন ঘরে পালিয়ে গেছে! একটা পয়সা পর্য্যন্ত রেখে যায় নি!...হঁ্যা হিসেবী চাকর বটে!

ইচ্ছা হ'ল—চীৎকার করে কাঁদি, না হয় মোহনবাবুর চুলের মুঠি ধরে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে এসে দেখাই,—আজ কী দুর্গতির মধ্যে তার কেষ্ট আমাদের ফেলে দিয়ে গেছে!

...কিন্তু একটা যেমন তেমন শব্দও আমার গলা দিয়ে বেরুলো না। আমি যেন বাহ্য সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেচি!

বাবা ভেতরে এলেন, মোহনবাবুও এলো।

আমি খালি বাক্সটা তাঁদের চোখের সুমুখে এগিয়ে দিয়ে, আস্তে আস্তে বাইরে চলে এলাম।

বাবা তখন ঘরের মধ্যে কান্না সুরু করে দিয়েছেন—

—আমি তো ভুলেও কারো অনিষ্ট করিনি মোহন! তবে এ সর্ব্বনাশ আমার হোল কেন?...আমি এখন কি করবো?

মোহনবাবুর বাক্‌রোধ হ'য়ে গেল।

দুজনেই বাইরে এসে দাঁড়ালেন। বাবার কান্না তখনও থামে নি।

আমি ব'ললাম—সব কান্না আজকেই কেঁদে ফেলো না বাবা! অদৃষ্ট আমাদের এত বেশী মন্দ যে, এই কান্নার পালা গেয়ে গেয়েই রাতদিন কাটাতে হবে।

এতক্ষনে মোহনবাবুর কথা বেরুলো। মুখখানায় রাজ্যের রাগ নিয়ে এসে ব'ললে—ইংরেজের রাজত্ব, সে ব্যাটা যাবে কোথায়? আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন রামবাবু! যেখান থেকে পারি আমি তাকে ধরে আন্‌ছি। কাল সকাল পর্য্যন্ত মিয়াদ রইলো। ব'লেই—আর এক সেকেণ্ডও দাঁড়ালো না—বাড়ী থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল।

বাবা খানিকক্ষণ হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে, ব'ললেন—দেখা যেয়ে নিই।...মোহন তাকে আন্‌বেই, এ ধারণা আমার যথেষ্ট আছে।

আমি কথা কইলাম না। কইতে ইচ্ছাও হ'লনা। ধীরে ধীরে রান্না ঘরের দরজাটা খুল্‌লাম।

কিন্তু...উঃ এত অত্যাচার সহ্য করবো কোন্ সহিষ্ণুতার শক্তি দিয়ে আজ!

হতভাগা কেষ্টা—হাঁড়ি থেকে ডাল তরকারী ভাত নিয়ে যা পেরেচে খেয়েচে,—যা পারে নি—ঘরের মেঝেয় ছড়িয়ে দিয়ে গেছে! হ্যাঁ—চালাক বটে! নইলে এত সাহসও হয়!

কিন্তু সেকি আমার নাকের গোড়ায় ক্ষৌরাকর্ম্ম দিয়েছিল!

নইলে এত ঘুম আমি পেয়েছিলুম কোত্থেকে ?...হায় হায়—এর চেয়ে যে মহাঘুম আসাই সৌভাগ্যের ছিল !

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি—বাবা তাঁর খোঁড়া পা-হাত নিয়েই বহুকষ্টে আসন পেতে ঠাঁই করে নিয়ে, আহার্য্যের প্রত্যাশায় ব'সে র'য়েচেন।

অক্ষম বাপকে দেখে, আজ আমার এতটুকু শক্তি হ'লনা যে, বলি—মা বসুন্ধরা ! তুমি দ্বিধা হও ! আমি তোমার গর্ভে ঢুকে আত্ম বিসর্জ্জন দিই !...যদি কপালগুণে বসুন্ধরা ফাঁক হ'য়ে আমাকে বুকে তুলে নেয়, তাহ'লে সর্ব্বস্বহারা বাবার আমার গতি কি হবে ! কে তাঁকে খেতে দেবে—নাওয়াবে—শুইয়ে দেবে ! নইলে আজ মৃত্যুকামনা ব্যতীত আমার অন্য কামনা করবার কিচ্ছু ছিল না।

বাবার বড্ড বেশী খিদে পেয়েছিল।

ব'ললাম—খাবার না কিনে আন্‌লে খেতে পাবে না বাবা ! তুমি পাঁচ মিনিট সবুর করো।

বাবা জিজ্ঞাসু হ'য়ে চাইতেই, তাঁকে কেষ্টর কীর্ত্তির কথা খুলে ব'ললাম। তারপর তাড়াতাড়ি কাপড়টা বদ্‌লে ফেলে—বাইরে যাবার জন্য বাবার অনুমতি চাইলাম।

ইস্কুলেই পড়ি, আর যেখানেই বেড়িয়ে আসি,—সে সব কবে ক'রেছি। এখন তার অভ্যাসটুকু মাত্র স্মৃতির সঙ্গে কথা কইতে আসে। তা ছাড়া বাবারও মতটা ইদানিং পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেছলো। আমার বাইরে যাওয়ার অভ্যাস রাখাটুকু তিনি পছন্দ করতেন না।

ব'ললেন—দরকার নেই মা! একটা রাত না খেয়ে থাকলে মানুষ ম'রে যায় না।

আমি ব'ললাম—তুমি থাকতে পারো বাবা!—যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে গোলাগুলির আঘাত নিতেই যখন সাহস এনেছিলে, তখন একটা রাত খাওয়ার দুঃখকে তুমি গ্রাহ্য করবে না—তা মানি, কিন্তু আমি কোনো রকমেই থাকতে পারবো না। না খেলে আমার কোনো রকমেই চ'লবে না।...তুমি নিশ্চিন্ত থাকো বাবা! হিঁদুর ঘরের মেয়ে হ'য়েও, রাস্তায় চ'লবার সাহস আমি যথেষ্ট রাখি।

বাবা আর কথা কইলেন না।

মানুষ যখন একান্ত নিরুপায় হ'য়ে পড়ে, তখন লক্ষ লক্ষ বিপদকে সে একবারও অসহ্য ব'লে ফিরিয়ে দেয় না। দেওয়ার শক্তিটাই তখন উপায়-হীনতার কাছে মাথা নুইয়ে পরাজয় মেনে নেয়।

...আমার আপন হাতবাক্সটায় যৎকিঞ্চিৎ পুঁজি ছিল, তাই থেকে খাবারের দাম বের ক'রে নিলাম।

...রাত্রি যখন বারোটার কাছাকাছি—তখন আমাদের পিতাপুত্রীর আহার শেষ হ'ল। তারপর সুরু হ'ল—বাকী রাত্রি জাগরণের পালা!...ঘুম হবে কোথেকে! পয়সার শোক, এ যে দুনিয়ার সব শোক-দুঃখের সেরা!

......এখন ভরসার মধ্যে, মোহনবাবুর কাছে যে টাকাটা পাওনা আছে।

আগেই বলেছি,—মোহনবাবুকে বিশ্বাস না করলেও, তার দ্বারা যে কখনো অমঙ্গল হ'তে পারে—এ ধারণা আমার মোটেই

ছিল না।...আজকের এই সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার পরেও তারই আশ্বাসবাণী সম্বল ক'রে প্রতীক্ষায় থাকতে হল।—ধারণার অতি গূঢ় অংশ হ'তে মন যেন আশা করছিল—পাবো হয়তো!—হয়তো মোহনবাবু কেষ্টকে ধরে নিয়ে আসবে। আমাদের শেষের সম্বল হাতছাড়া হবে না।

কিন্তু সকাল থেকে ঘড়ির ঘণ্টা শুনে শুনে এগারোটা বাজিয়ে দিলাম—তবু মোহনবাবুর দেখা সাক্ষাৎ নাই! কেষ্টকে পেলে কি পেলে না—সে খবরও পাওয়া গেল না।

বাবাকে বাইরে বসিয়ে রেখে আমি সদর দরজার কপাট ধরে-এগারোটার পর থেকে ঠায়—বারোটা পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলাম—কিন্তু সব নিষ্ফল!—মোহনবাবু ফিরলো না।

বাবা কিন্তু কেবলই বলেন—এই এলো—এই এলো।

তারপর বেলা যখন দুটো বেজে গেল, তখন প্রবল দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ব'ললেন—আমাদের জন্যে ছোক্‌রাকেও কম ভুগতে হ'লনা। বেলা অপরাহ্ন হ'য়ে এলো, তবু না আছে নাওয়া না আছে খাওয়া।

কথাটা আমার মনে ও যে ওঠে নি তা নয়। কিন্তু সান্ত্বনা পেলাম এই ভেবে যে, এ কাজে সম্ভবতঃ মোহনবাবুর বিরক্তি আসবে না। কেননা, একদিন তার মুখ থেকেই শুনতে পেয়েছিলাম—পর-হিতার্থে যে কষ্ট, সে কষ্ট তার সুখ!

...এখনও আমাদের স্নানাহার হয় নি।

উৎকণ্ঠার আক্রমনে পড়লে মানুষের তৃষ্ণার খাওয়ার বালাই থাকে না। আমাদেরও ছিল না। কিন্তু উৎকণ্ঠা যখন একঘেয়ে

হয়ে পড়ে, তখন বেঁচে থাকতে হলে খেতেও হয়। তাই ছুটোর পর উনুন ধরিয়ে রান্না চাপিয়ে দিলাম।

বাবার কথা শুনে হাসি এল। হঠাৎ বলে বসলেন—মোহনকে আবার তার মেসে যেতে হবে, একেই তো হায়রাণ হয়ে ফিরে আসচে। তার জন্যেও চারটিখানি চাল নিস মা!

পোড়াকপাল আমার!—মোহনবাবু ফিরে আসবে, আমাদের হারানো ধন আবার ফিরে পাবো!

* * * সে দিন গেল, রাতও গেল, পরের দিন বেলা দশটার আমলে পাড়ার একটা ছোট ছেলের হাতে পাঁচটা পয়সা দিয়ে, বাবা একখানা রিক্সা ডেকে আনালেন। তারপর আমাকে খুব সাবধানে থাকতে ব'লে, কি জানি কি রকম অনুসন্ধানের সূত্র ধ'রে বেরিয়ে পড়লেন—তা তিনিই জানেন। আমার লক্ষ নিষেধকে মোটেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না।

বাবার খাওয়া হ'য়ে গেলে, তাঁর পাতেই আমি খেয়ে নিয়েছিলাম।

কিন্তু বাবার বাইরে যাওয়ার পর থেকে এই ঘণ্টাখানেক যে কি ভাবে কাটলো—তা ভাবতে গেলেই সব গোলমাল হয়ে পড়ে। মাগো!—জীবনে এমন হ'য়ে একা আমি কখনো থাকি নি!

মাথায় বুদ্ধি গজালো।—

বাবা অনুসন্ধানের অজ্ঞাত সূত্র ধরতে বেরিয়ে গেলেন,—আমিই বা সামর্থ্য থাকতে ব'সে ব'সে ভাবনার জাল বুনি কেন? মনে পড়লো—মোহনবাবুদের মেসের সেই দেড়শো টাকা মাইনের বাবুটির কথা।...বংশ উঁচু হ'লে, হয়তো তাঁর সঙ্গেই আমার

জীবন-মরণের সম্বন্ধ অটুট হ'য়ে যেত। ভাবলাম—তাঁর কাছে গেলে হয়তো মোহনবাবুর আভ্যন্তরিক পরিচয় বা অন্যান্য জান্‌বার বিষয়ও জেনে আসতে পারবো। এতক্ষণে মোহনবাবুর ওপর আমার অবিশ্বাসের মাত্রাটা অত্যন্ত বেশী হ'য়ে পড়লো।...কেষ্টা যা নিয়ে পালিয়েছে, তার ভরসা বাবা করেন করুন, কিন্তু আমি করি না। মোহনবাবুর স্তোকবাক্যে ভুলে থাক্‌বার মত মানসিক অবস্থা আমি হয়তো,—হয়তো কেন—সত্যসত্যই হারিয়ে ফেলেছি! এখন 'কাল দেব' ব'লে যে বারো শো টাকা হাত ক'রে নিয়েছে—সেই টাকা গুলোর উদ্ধারই আমার সব চেয়ে বেশী জরুরী ব'লে মনে হ'ল। কেষ্টর সন্ধান না চেয়ে মোহনের সন্ধান চাইতেই তার মেসে যাবার সঙ্কল্প ক'রে, ঘর দোরে চাবি এঁটে রাস্তায় বেরুলাম।...মোহনবাবুর মেসের ঠিকানা আমি তার মুখেই একদিন শুনেছিলাম।

যে ছোট্ট ছেলেটিকে পাঁচ পয়সা বক্‌সিস দিয়ে বাবা রিক্সা ডেকে আনিয়েছিলেন, তাকেই দশপয়সার লোভ দেখিয়ে, বাইরের রকটায় বসিয়ে রেখে গেলাম।···বাবা ফিরে এসে, আমাকে না দেখে পাছে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন, এই আশঙ্কায় একখানা চিঠিও তার কাছে লিখে দিলাম।...···

...বেলেঘাটারই একটা চওড়া রাস্তার ওপর মোহনবাবুদের মেস। নম্বর দেখে, যে বাড়ীটার দরজার কাছে এসে হাজির হ'লাম—সেখানা মেসের মতন বড় গোলমেলে বাড়ী নয়। দিব্যি নিরিবিলি, ভেতরে যে অনেকগুলি বাবু স্ত্রী-পুত্র ছাড়া হ'য়ে একসঙ্গে বাস করেন, সে চিহ্ন

বাহির থেকে একটুও পাওয়া যায় না।...আমার কিন্তু বরাবরই ধারণা ছিল—মেস মানে হট্টগোলের ওয়ার্কশপ!

দরজায় জোরে কড়া নাড়তেই—একটা উড়ে চাকর এসে সুমুখে দাঁড়ালো।

এতক্ষণে খেয়াল হ'ল—বাবার মুখে সেই লোকটির মাইনের খবরটাই শুনেছিলাম। নামটা তো শুনতে পাইনি! এখন কি বলে খুঁজি?

চাকরটা আমার মুখপানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বোধ হয় খুবই অবাক্ হ'য়ে গেছলো। তাকে ব'ললাম—মোহনবাবুকে ডেকে দাও তো!

আর বিলম্ব হ'ল না। সঙ্গে সঙ্গে সে ভিতরে চ'লে গেল।

এইবার যিনি এলেন—তিনি ভদ্রলোক। কিন্তু বয়সে মোহনবাবুদের মতই। আমি তাঁকে নমস্কার ক'রে ব'ললাম—এই মেসের মোহনবাবুকে আমি চাই।

বাবুটির ভাবভঙ্গি দেখে বুঝ্‌লাম—তিনি ভয়ানক বিস্মিত হ'য়ে পড়েছেন।

ব'ললেন—মোহনবাবু ব'লে কেউ তো এখানে থাকে না! আপনি কোত্থেকে আসচেন?

আমি কোন রকমে পায়ের কাঁপুনিটাকে দমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি যোগাড় করছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—এটা মেস তো?

বাবুটি এইবার ঈষৎ হেসে অত্যন্ত বিনীত ভাবে ব'ললেন—আজ্ঞে না, এটা মেস নয়। আপনি তা হ'লে ঠিকানা ভুল ক'রেছেন।... কত নম্বর ঠিক বলুন তো!

ব'ললাম—নম্বর-ঠিকানা কিছু ভুল হয় নি মশায়।...যিনি ব'লেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই অসাধারণ পুরুষ !...কিন্তু আর আপনাকে বিরক্ত করবো না।...নমস্কার !

ভদ্রলোক কিন্তু নড়তে চাইলেন না, আমাকেও ফিরে আসার পথ দিলেন না।

আমি ব'ললাম—অসময়ে এবং হয়তো বা কাজের সময়ে আপনাকে বিরক্ত ক'রেছি, তার জন্যে মাপ চাওয়া ভিন্ন আর কিছুই বলবার নেই। কিন্তু যদি কিছু মনে না করেন, তা হ'লে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—

ভদ্রলোকটী স্মিতমুখে ব'ললেন—মনে যে কিছু করবো না, সেটা এই পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকা দেখেই আপনার বোঝা উচিত ছিল। আমি আপনার বক্তব্য শুনবার জন্যেই উৎসুক হ'য়ে প'ড়েচি !... পরিচয় নেই, জানা শোনা নেই,—অথচ আপনার যে কি হ'য়েচে, সেটুকু জানতে যে অত্যন্ত কৌতূহল,—এটা অনেক মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক !...এখন দয়া ক'রে বলুন, কি ব'লবেন—

আমি ব'ললাম—মোহনবাবু নামে, যে বাবুটির সন্ধান নিতে আপনার এখানে এসে প'ড়েচি, একদিন তাঁর মুখ থেকেই জেনেছিলাম—আপনি কি একটা আফিসে, দেড়শোটাকা মাইনের চাকরী করেন, কেবল নামটা জানবার সুযোগ মেলে নি। সন্দেহের দোলায় দোল খাচ্ছি,—সঙ্গীন অবস্থায় প'ড়ে হয়তো ভদ্রতারও সীমা ছাড়তে হচ্ছে,—কিন্তু ঐ এক কথা—মার্জ্জনা ভিক্ষাই আমার সম্বল।

ভদ্রলোকটি ব'ললেন—ভুল দিয়ে যার মূল পত্তন হয়, তার মাঝের অংশ ও সত্যহীন, কেমনা—গোড়ায় ভ্রান্তি, মাঝেয় সত্যকে

আপন দলে টেনে নেয়। মোহনবাবুর অস্তিত্বই যখন এখানকার লোকে মান্‌লে না, তখন তার অন্যান্য খবরটাই যে সত্যি হবে, এ কথা কদাচ বিশ্বাস করবেন না। আমি কোনো আফিসেই চাকরী করিনে, সুতরাং দেড়শো টাকা মাইনেও পাইনে। আর নাম? সে তো আপনি শুন্‌তেই পান নি।...কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—আপনার মোহনবাবু কি উদ্দেশ্যে আমার ঠিকানা দিয়ে, কল্পিতভাবে আমাকে বর্ণনা ক'রেছিলেন?

আমি সলজ্জ হ'য়ে ব'ললাম—সে সব কথার কোনো দাম নেই, অর্থও নেই, তা ছাড়া গুছিয়ে ব'লতেও আমি পারবো না এখন। তবে এইটুকু মাত্র জেনে রাখুন—অনিষ্ট হওয়ার মত কিছু নেই।

আমার কপাল দিয়ে দর দর ধারে ঘাম ঝরছিল।

ভদ্রলোকটি বললেন—হয়তো প্রবঞ্চক জোচ্চোরের হাতে প'ড়ে বিপন্ন হয়েচেন, নয়তো শুন্‌বার ভুলে ঠিকানা হারিয়েচেন, একটা কিছু গোলমাল হয়েচেই।...কিন্তু ভরা দুপুরে,...যদি সম্ভব হয়, তা হলে আমাদের এখানেই বিশ্রাম করুন। রদ্দুরের তেজ কমলে তখন রওনা হবেন।

আমার বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল না। যে অবস্থায় ভগবান ফেলেচেন, তাতে বিশ্রামের কথাই মনে ওঠে না। কিন্তু তবু বিশ্রাম নিতে হ'ল। উদ্দেশ্য—এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে ভাল করে আলাপ করি।—লোক-চরিত্র বুঝবার সৌভাগ্য আজ মোহনবাবু আর কেষ্টধনের দয়াতেই প্রথম পেয়েছি কি না! তাই ভবিষ্যতের সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় পাওয়াটা উচিত বলেই মনে করলাম। ব'ললাম—বিশ্রামের এতটুকু দরকার

আছে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু কোথায় যে যাবো, তা ও ভেবে পাচ্ছি না।...কাজেই খানিকটুকু সময় কাটানোর দরকার হ'য়ে পড়েচে।

—"তা হলে আসুন! ভেতরে ভাল হ'য়ে ব'সবেন" ব'লে ভদ্রলোকটি আমাকে যথেষ্ট খাতির করেই ভিতর বাড়ীতে নিয়ে এলেন।

...দোতলার ওপর, খুব ভাল রকম করে সাজানো একখানা মাঝারি ঘর, চারধারে লম্বা লম্বা ছবি-আয়নার বালাই নেই, অথচ তাকে সাজানো না বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। অতি সুন্দর ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে মেঝে, দেওয়ালের কোথাও একটা কাল কি অন্য রঙের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই, দুটি আলমারী বোঝাই বই, আর খান তিন সোফা, একখানা পালঙ্ক, একখানা টেবিল আর দুখানা কুশন চেয়ার!—সুমুখের দেওয়ালে প্রকাণ্ড একটা ঘড়ি টাঙানো। অন্য অন্য অনেক আসবাবপত্র পাশের ঘরটায় রাখা হ'য়েচে,...পাশের ঘর এঘর থেকে আধাআধি ভাবে নজরে পড়ে।

ভদ্রলোক আমাকে বসতে অনুরোধ করলেন।

দুখানা চেয়ারের একখানা টেনে নিয়ে ব'সতে যাচ্ছি, ব'ললেন—আপনি ক্লান্ত হ'য়েচেন—স্বীকার করতে না চাইলেও, মুখ-চোখ তার প্রমাণ দিচ্ছে!...ঐ সোফায় ভাল করে বিশ্রাম করুন।...ঘুমুতে ইচ্ছে হয় তো খানিক ঘুমিয়ে নিতে পারেন। তাতে ফল ভালই হবে।...আমি বরং পাশের ঘরে যাচ্ছি...

আমি পরম আপ্যায়িত হ'য়ে গেলাম। লোক-চরিত্র হয়তো জীবনে কখনো বুঝতে পারবো না, কিন্তু এ চরিত্রটুকু বুঝতে আজ দেরী হ'ল না।...মোহনবাবুর সঙ্গে আর এঁর সঙ্গে! আকাশ পাতাল

তফাৎ! কিন্তু ভগবানের কাছে আজ এই আর্জ্জি দাখিল ক'রে রাখচি—হে ভগবান! যদি আজকের বোঝাও আমার ভুল করে বোঝা হয়, তা হলে অবুঝকে শাস্তির পরিমাণ কম দিয়ো যেন! সহ্য করবারও যে সীমা হারাতে হয়, সে কি সৃষ্টিকর্ত্তা হয়েও তোমার জানা নেই?

বল্‌লাম—নানা কারণে আমার মানসিক অবস্থা ভাল নয়, ঘুমকে সাধ্য সাধনা করলেও সে আসবে না। আপনি তার জন্যে ব্যস্ত না হলেই আমি বেশী নিশ্চিন্ত হবো।

ভদ্রলোক অল্প অল্প হাস্‌তে হাস্‌তে উঠে যাচ্ছেন দেখে, আমার ভারি আশ্চর্য্য ঠেক্‌লো! জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় চলেছেন?

—আপনি বিশ্রাম করুন, আমি পাশের ঘরে থাক্‌চি।...

আমি বললাম—সঙ্কোচ করবার এতটুকু কারণ নেই।...ছেলে বেলা থেকে ইস্কুল আর পড়া আর ক্লাস—এই সবের অনুগ্রহে আমি যখন তখন লজ্জায় জবু থবু হয়ে যাবার মতন বিপদে পড়তে শিখি নি।... এক্ষুণি বললাম—মানসিক অবস্থা আমার ভাল না, আপনি থাকলে বরং গল্প করেই ভাল কাটবে।

ভদ্রলোক প্রশান্ত হাসি দিয়ে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, এইবার বসে বললেন—পরস্পর পরস্পরকে কি বলে সম্বোধন করবে, এ সমস্যারই সমাধান হল না,—গল্প জমবে কেমন ক'রে?

আমার বাস্তবিকই লজ্জা হ'ল। বাবার শারীরিক অক্ষমতার জন্য আমি বাইরে আসা বন্ধ করে দিয়েছি—সে ও বেশী দিনের কথা নয়।

কিন্তু বাবা যখন যুদ্ধে গেছলেন, তার আগে থেকেই লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার সঙ্কোচ আমার ছিল না। ইদানিং কোথাও যাওয়া আসার যেমন প্রয়োজন ছিল না, বাবার অনিচ্ছার প্রাবল্য বুঝতেও তেমনি দেরী হ'ত না। নইলে, আপন মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রেখে, যে কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করবার বাহাদুরী আমি হারাই নি। কিন্তু কি মোলায়েম বল্‌বার ভঙ্গী—এই ভদ্রলোকটির! মহিলার সম্মান রাখতে ইনি যেমন শিখেচেন, মোহনবাবু যদি তার এক সিকিও শিখ্‌তো, তা হ'লে আজ অতি বড় বিপন্নের স্থান অধিকার করে, এই অসময়ে অচেনা জায়গায় এসে সময় কাটাবার দুর্ভাগ্য হ'ত না। কিন্তু দুর্ভাগ্য স্বীকার ক'রতেও আজ সাহস হচ্ছে না আমার!

ব'ললাম—যে দিন মোহনবাবুর মুখ থেকে, আপনি না হ'লেও আপনারই কল্পিত পরিচয় পেয়েছিলাম, সেই দিন থেকে শোনার সময়টি ছাড়া, আর একদিনও আপনার কথা আমার চিন্তা করবার প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু যেদিন প্রয়োজন হল, সেই দিনই একান্ত সহায় রূপেই আপনাকে আমি ভেবে নিয়েছিলাম। অথচ ভুলেও ভাবিনি যে, গোড়াপত্তনটাই প্রকাণ্ড একটা মিথ্যার আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েচে! আপনি বিজ্ঞ এবং বিদ্বান, আপনার সুমুখে ব'সে বড় বড় কথা বললে আমার অনধিকার চর্চ্চারই প্রমাণ হ'য়ে যাবে। নইলে বল্‌তাম—মানুষ অকূলে ভাসলে—তৃণখণ্ডকেও বড় সহায় ব'লে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু খুব সত্য কথাই আপনি ব'লেছেন,—পরস্পরকে সম্বোধন করবার সূত্রটাই আগে খুঁজতে হবে। বয়সে আপনার চেয়ে আমি ছোট,

সুতরাং আমাকে নাম ধ'রেই ডাক্‌বেন!—আমার নাম—সুপ্রিয়া বোস। এই বেলেঘাটারই একটি সরু গলিতে আমার বাড়ী। সেখানে বাবা আর আমি, এ ছাড়া তৃতীয় প্রাণী থাকে না। আমার বাবার নাম শ্রীযুক্ত রামলোচন বোস।

ভদ্রলোক অবহিত হয়ে আমার কথাবার্ত্তা শুনছিলেন। পরিচয় দেওয়া শেষ হয়ে গেলে, বললেন—আপনার পালা তো আপনি শেষ করলেন, এইবার আমার পালা সুরু করি,—প্রথমেই নাম বলছি,—রত্নাকর রায়। এটা আমার ভাড়াটে বাড়ী। একটা কম্বাইণ্ড্ হ্যাণ্ড 'উড়ে বয়' নিয়ে সংসার। মেদিনীপুরে আমাদের বাড়ী। সেখানে মা আছেন, আর কেউ নেই। মাকেও দাস দাসীর সাহায্যে সংসার কর্‌তে হয়।

পরিচয়ের হাঙ্গামা তো শেষ হ'ল। কিন্তু আমার খট্‌কাটুকু এখনও ভাঙলো না!—দেড়শো টাকা মাইনের চাকরীও করেন না, মেসে ফেসেও বাস করেন না, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের ও ধার ধারেন না, অথচ জগন্নাথ মার্কা 'বয়'কে কর্ণধার করে রত্নাকরবাবু ক'লকাতায় থাকেন কি প্রয়োজনে!

কিন্তু ভদ্রলোক সত্যসত্যই বিজ্ঞ। আপনা থেকেই জানিয়ে দিলেন—আমি এখানে ডাক্তারী পড়ি। মেডিকেল কলেজে এবার আমার sixth year. (ষষ্ঠবর্ষ) চ'লছে। তারপর হেসে ব'ললেন—আচ্ছা সত্যি ক'রে বলুন তো, সুপ্রিয়া দেবী!—আপনি কি হিসেবে আমাকে বিজ্ঞ আর বিদ্বান ব'লে ঠাট্টা করলেন?...ঐ দুটো কথার মানে পর্য্যন্ত যার জানা নেই—

আমি বাস্তবিকই কৌতুক বোধ করলাম। জবাব দিলাম—আপনিই আগে বলুন—ঠাট্টা ক'রেছি—এই কথাটা কি সূত্র ধ'রে বলে, আমাকে মিছি মিছি লজ্জিত করলেন? কথার মানে জানেন না, অথচ ঝোপ বুঝে কোপ মারতে তো একটুও ভুল হ'ল না?...বিজ্ঞ আর বিদ্বান এই দুটো কথার মানে আমি ছেলেবেলা থেকে 'মানে-বই' নিয়ে এত বেশী মুখস্থ ক'রে রেখেচি যে, যার ভেতর এই দুটো জিনিষ থাকে, তার চেহারা দেখলে টের পাই।

রত্নাকরবাবু হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ললেন—পরাস্ত হয়েচি, না জেনে আর ঠাট্টা করতে সাহস করবো না। কিন্তু বাস্তবিক একটা বিষয় আপনাকে এখনো বলা হয় নি, অথচ সেইটাই আমার পরিচয়ের মূল অঙ্গ। আপনি বোস্, সুতরাং কায়স্থ—হিন্দু?

—হ্যাঁ।—

—আমি রায়, কিন্তু কায়স্থও না ব্রাহ্মণও না—

—তবে?

—আমরা ব্রাহ্ম।

আমি বিস্ময় বোধ করি নি, কেন না—ক'লকাতায় ছেলেবেলা থেকে কাটিয়েছি, এখনো সেই ক'লকাতাই আমার স্থায়ী বাসভূমি। স্কুলে পড়ার সময়ে অনেক ব্রাহ্ম মেয়েদের সঙ্গে আমার সখীত্ব হয়েছিল। কতকগুলো পূজো অর্চ্চনার ব্যাপার ছাড়া হিন্দু আর ব্রাহ্মর মধ্যে ভেদাভেদটুকু আমি সহজে ধরতেই পারতাম না। জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার মা এখানে আসেন না?

রত্নাকরবাবু আমার দিকে একটা বিস্ময়ের চাহনি চেয়ে ব'ললেন—

'বিজ্ঞ' কথাটা আমার নামের আগে না বসিয়ে, আপনার নামের আগে বসালেই বেশী মানাবে সুপ্রিয়া দেবী!···মায়ের আসা না আসার বিবরণই যে আসল পরিচয় ব্যক্ত করবে, এটুকু ধরতে চেয়েই আপনি যথেষ্ট বাহাদুরী দেখালেন।...মা এখানে মোটেই আসতে চান না। কারণ—আমি স্বেচ্ছায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেচি। মা আমার গোঁড়া হিন্দু। আমার নতুন ধর্ম্মকে তিনি অনাচার ব'লে দুঃখ করেন।··· যখন দেশে যাই, তখন অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়েই আমাকে মায়ের মর্য্যাদা রাখতে হয়।

প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে ফেল্‌তে ইচ্ছা হ'ল। বললাম—আপনি বললেন—ডাক্তারী পড়ি। কিন্তু তার তো কোন চিহ্নই ঘর-দোরে খুঁজে পেলাম না! মড়ার হাড়, স্কেলিটন, ছুরী, ষ্টেথ্‌স্‌কোপ্‌—এসব কই আপনার?

রত্নাকরবাবু হো হো করে হাস্‌তে লাগলেন।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম—দেখুন, মোহনবাবুর সম্বন্ধে বিশেষ করে কিছু এখনো আপনাকে জানাই নি, কিন্তু এইটুকু মাত্র শুনে রাখুন—তাঁর ব্যবহারে আমি মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখার দৃঢ়তা হারিয়েচি।···আজ হঠাৎ আপানার সঙ্গে পরিচিত হওয়াকে আমি আমার সৌভাগ্য ছাড়া অন্য কিছু মনে ভাবি নে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের চরম হবে আমার তখনই, যখন আপনার কথার ওপরেও আস্থা রাখবার বল হারিয়ে ফেল্‌বো!···সত্যি ব'লছি রত্নাকরবাবু! সত্যকেও যদি সন্দেহের মধ্যে নিয়ে এসে থাকি, তাহলে সে দোষের মার্জ্জনা দেবেন। কিন্তু সন্দেহ যখন মনে এসেচে, তখন তা ভঞ্জনের জন্যে আমি আপনাকেই দায়ী করবো।...

রত্নাকরবাবুর সেই প্রচণ্ড হাসি!

আমার প্রথমে হ'ল রাগ, তারপর দুঃখ!...অভিমানকে অন্তরে জায়গা দিতে সাহস হচ্ছিল না...কি তার অধিকার!

কিন্তু রত্নাকরবাবু আর নীরব হয়ে খালি হাসি দিয়েই আমার রাগ এবং সন্দেহকে বাড়িয়ে তুললেন না। হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললেন—আসুন মিস্ বোস্! সন্দেহ ভঞ্জনের ভার যখন আমাকেই দিয়ে ফেলেচেন, তখন আদেশ অমান্য করে আপনার মর্য্যাদাহানি কর্‌বো না।...উঠে আসুন আমার সঙ্গে! কিন্তু কি কি চাই আপনার? মড়ার হাড়? স্কেলিটান্? আর কি—ষ্টেথস্কোপ?

আমি সহসা মুখ তুলে তাঁর দিকে চাইতেই পারলাম না। স্পর্দ্ধার মুখে যখন আকস্মিক আঘাত পড়ে, তখন মানুষের মনটুকু আপনা হতেই ম্লান হ'য়ে আসে।

আমি অত্যন্ত অপ্রতিভ হ'য়ে পড়লাম, কিন্তু যা জানতে বা দেখতে চেয়েছি, তখনও তা আমার জানা বা দেখা শেষ হয়ে যায় নি।

রত্নাকরবাবু বললেন—কৌতূহল বা সন্দেহ দুটোর দিক দিয়েই বলা চলে—কষ্ট না করলে, কারো আসল ধরা যায় না।...আপনি না উঠে এলে, কেমন করে দেখাবো?

আমার মনে হল—বলে ফেলি—মাপ করুন মশায়! আপনাকে আমি বৃথাই সন্দেহ করেছি! আপনার ডাক্তারী পড়ার সরঞ্জাম মজুত আছে, আর আমি দেখবো না। কিন্তু তখনই মোহনলালের কপটতার কথা স্মরণে এলো!—আমি বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে পড়লাম।...

যে ঘরে আমরা বসে ছিলাম, তার পাশের ঘরের লাগা একটা ছোট্ট কুঠুরীঘর ছিল। অন্ধকার! আলো ঢোকে না। জান্‌লা নাই বলে বাতাসও ঢুকতে পায় না। সেই ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রত্নাকরবাবু বললেন—আপনি ভেতরে আসবেন না। বলেই তিনি ভেতরে ঢুকে গেলেন, তারপর প্রকাণ্ড একটা কাঠের সিন্ধুক থেকে যা সর্ব্বপ্রথমে বের করে এনে আমার চোখের সাম্‌নে ধরলেন,—সেখানা হাড় নয়, স্কেলিটান নয়, ষ্টেথস্‌কোপ্‌ও নয়,—কোন এক হতভাগ্যের ছিন্ন হস্তাংশ!—এখনো কাঁচা রয়েচে!

আমি ভয়ে হাত তিন চার পিছিয়ে এলাম।

রত্নাকরবাবু এইবার যে হাসি হাসলেন, আমার কাছে সত্যই এখন তা প্রশান্ত এবং প্রকৃত সরল বলে মনে হ'ল। বললেন—হাড়-গোড় দেখতে চান যদি তো তাও দেখাতে পারবো। কিন্তু এই হাত খানাকে নিয়ে আজ সারা সকালটাই আমার কেটে গেছে। ডিসেক্‌ট করতে হয় ফার্ষ্ট ইয়ারে, কিন্তু সিক্‌স্‌থ্‌ ইয়ারে এসে অনেক দিকে ভুল ভ্রান্তি হয়, সেইজন্যে আজ নতুন করে এগুলো ঝালিয়ে নিচ্ছিলাম।... বলতে বলতে হাতখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে লাগলেন।

দেখলাম—মাঝামাঝি চিরে, অনেক শিরা-উপশিরার পরীক্ষা হ'য়ে গেছে।

আমার আর ইচ্ছা হ'ল না যে, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি।

কিন্তু রত্নাকরবাবু সহজে ছেড়ে দিলেন না। বললেন—অনুমতি করেন তো এটাকে রেখে দিয়ে স্কেলিটান্‌টার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই!...অনেক টাকার খরিদ, আর ভারি আমার বশীভূত,...

তারপর ষ্টেথস্কোপ্, ছুরী, কাঁচি যা যা বরাত করবেন সব নিয়ে এসে হাজির কর্‌বো।

আমি অনুতপ্তের সুরে বলে উঠলাম—রেহাই দিন রত্নাকরবাবু! এই দেখার দায় থেকে আমাকে খালাস দিন!...ভুল-ভ্রান্তি আপনার হবে, আর আমারই কি হ'তে মানা?...না হয় বুদ্ধির দোষেই অন্যায় করে দেখবার ইচ্ছা জানিয়েছিলাম, কিন্তু তারও তো প্রায়শ্চিত্ত হ'ল!

হাসির ফোয়ারা ছুটে গেল!

রত্নাকরবাবু ঘরের কপাট বন্ধ করে দিলেন।......

...অপরাহ্ন হ'তে দেরী ছিল না।

...কথায় কথায় এত সময় কেটেছে!

মনে পড়লো—বাবা ফিরে এসে, এতক্ষণ কতই না অসুবিধা ভোগ করছেন!

আগের ঘর খানায় ফিরে এসে বললাম—অসম্পূর্ণ আলাপ আজকের মত সম্পূর্ণ হোক্ রত্নাকরবাবু! আমাকে উঠ্‌তে হচ্ছে।

রত্নাকরবাবুর বিস্ময়ের আর সীমা নেই! বললেন—এখনি শুন্‌লাম—সময় কাটে না, আবার এখন দেখছি—সময় কাটাতে চাওয়াও আপনার একের নম্বর ঝকমারী!

আমি মাথা হেঁট করে বললাম—আগেই ব'লে রেখেচি—আপনি বিজ্ঞ এবং বিদ্বান।...কথায় পেরে উঠি এ দুঃসাহস আমার কখনো হবে না।...বলেছি তো আমার বাবা শারীরিক অক্ষম!...ঐ যে মোহনবাবুর নাম করলাম, তাঁরই চাতুরীর জালে পড়ে আপাততঃ আমরা

দারুণ বিপদে পড়ে গেছি। বাবা এই সম্বন্ধে কোন কিছুর কিনারা করতে বাইরে গেছেন। তাঁর ফিরে আসার সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। এখনো বাইরে থাকাটা আমার কোনো রকমেই উচিত হবে না মিঃ রায়!

মিষ্টার রায় মৌন হয়ে আমার সকল কথাই মেনে নিলেন। তার পর টেবিলের ওপর থেকে একটা ছোট কাগজের টুক্‌রো তুলে নিয়ে, আমার সুমুখে রেখে বললেন—ঠিকানাটা পষ্ট ক'রে লিখে দিয়ে যান। মানুষের ঘর সংসার, বিপদের বেড়ায় চারধার ঘেরা।

আমার বুকটা বেদনায় টন্‌ টন্‌ ক'রে উঠলো। হায়রে সংসার! বলিহারী যাই তোর ঘর-বাড়ীর শোভা-সম্পদ্‌ দেখে! বললাম —আপনার এই কথাটা আজ নতুন শুন্‌লাম না রত্নাকরবাবু!—এই চিন্তাটুকুই আমার মজ্জায় মজ্জায় মিশে র'য়েচে। বিপদের যে বেড়া-জালে আটক্‌ পড়ে আছি, তার চেয়ে সাংঘাতিক বলতে আর কিছু যে হ'তে পারে—এটুকু আমার মত আপনিও বোধহয় ধারণায় আনতে সাহসী হবেন না,—যদি আজ খুঁটি-নাটি করে সমস্তটা আপনাকে ব'লবার সময় পেতাম।...কিন্তু কথাই কথার রাশ টেনে নিয়ে আসে।...আজকের মত বিদায় হই।

রত্নাকরবাবু গম্ভীর হয়ে ব'ললেন—সাংঘাতিক বিপদ আপনি কাকে বলছেন সুপ্রিয়া দেবী? ওরকম বিপদ নিয়ে দুনিয়ার সাড়ে পনের আনা লোক গলা গলি ভাব করে থাকে। বিপদ সহ্যের সীমা ছাড়াতে যায় তখনই, যখন অচিন্ত্যনীয় কিছু ঘটে যায়।...ধরুন না—হাস্‌তে হাস্‌তেই বলুন, আর কাঁদতে কাঁদতেই বলুন—এই যে আলোচনার পর

আলোচনা চলেছে, এব সমস্ত সুখ দুঃখকে পাথরচাপা দিয়ে যদি আকাশের বাজটা হঠাৎ ছিট্‌কে এসে আমাদের মাথায় চেপে পড়ে, তাহ'লে মা বাপ ব'লবারও ফুরসৎ মেলে না।...যন্ত্রণার সময় বাক্‌-শক্তি কেড়ে নিলে, সহিষ্ণুতার সঙ্গে সখ্য রাখা চলে একথাও যেমন মানি, আবার চলে না—একথাও ঠিক তেমনি করে মেনে নিই।

আমি ব'লে উঠ্‌লাম—জীবন থাকা না থাকার ব্যাপার নিয়ে কোনো তর্ক চলে না রত্নাকরবাবু! জন্ম হ'তে হ'তেই মৃত্যু তার আসন বিছিয়ে রাখে,—ওৎপেতে থাকাই তার ধর্ম্ম।...আর মন্দ সংবাদ? সে তো বাতাসে ভর করে লোকের দোরে দোরে ঘুরে বেড়ায়!...ব'লতে ব'লতে আমাদের ঠিকানাটুকু কাগজে লিখে ফেল্‌লাম।

রত্নাকরবাবু তাঁর টেবিলের দেরাজে লেখানা রাখ্‌তে রাখ্‌তে ব'ল্লেন—আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে যদি আপনার কোনো সংবাদ না পাই, তাহ'লে এটার দরকার হবে।

আমি সামান্য একটু হাস্‌লাম। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে, নমস্কার ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়্‌লাম।

রত্নাকরবাবু আমার সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা পর্য্যন্ত এসে, হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে নমস্কার করলেন।

---

* * *
* *

বাবা বাইরের রক্টায় আধশোয়া হ'য়ে প'ড়ে র'য়েচেন। মুখখানা আষাঢ়ের আকাশের মত !

আমার ভয় হ'ল। হয়তো বকে অনর্থ করে তুল্‌বেন।

কিন্তু বকা দূরের কথা, আমাকে দেখেই, হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লেন।

কাছে গিয়ে গা ঘেঁসে ব'সে, মাথায় হাত রেখে ব'ললাম—অমন ক'রো না বাবা ! আমার বড্ড ভয় করে। যা গেছে, আর তো তা ফিরে আসবে না,...কপাল নিয়ে খেলা—হার-জিৎ আছেই।

বাবার কান্না যেন দ্বিগুণিত হ'য়ে উঠ্‌লো। ডান হাত দিয়ে আমার চোখদুটো মুছিয়ে দিতে দিতে ব'ললেন—হার-জিতের কথা কি আমিই জানিনে মা ! কিন্তু কি ব'লবো সুপি, এতবড় হার যে সহের বাইরে চ'লে এসেচে !...রামলোচন বোস বরাবরই জান্‌তো—বুকখানা তার লোহার চেয়েও শক্ত। নইলে মানুষ মারতে আর মানুষের হাতে মরতে, সে পত্নী-কন্যাকে অসহায় ক'রে রেখে যুদ্ধে চ'লে যেত' না।...ভয় কাকে বলে আমি বুঝতে শিখি নি সুপ্রিয়া,... আজ মোহন দাঁতে দাঁতে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে !...অহঙ্কার ছিল—সমস্ত বিপদকে আমি তুচ্ছ ভাব্‌তে পারি। কিন্তু তা-ও আজ ধূলোর সঙ্গে মিশে গেছে !

বড্ড ভয় হ'ল, দুশ্চিন্তারও অবধি রইলো না। কাঁদ-কাঁদ হ'য়ে ব'ললাম—পষ্ট ক'রে খুলে বলো বাবা!

বাবা বললেন—বৌবাজারের মোড়ে মোহনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল মা!...বসুমতী-আফিসে যাচ্ছিলাম—কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেব ব'লে।—মোহন কোত্থেকে ছুটে এসে, কাঁদ কাঁদ হ'য়ে আমার সুমুখে এসে দাঁড়ালো। একটা কথাও মুখথেকে বের করতে দিলে না,—বললে—অনেক কষ্টে কেষ্টা ছোঁড়ার সন্ধান মিলেছে। টাকা কড়ি সব পাওয়া যাবে। কাল থেকে পঁচিশ টাকা খরচা করে পুলিশের মন জুগিয়ে জুগিয়ে ব্যাটাকে থানায় ধ'রে এনেচি।...রিক্সা থামিয়ে আমি তাকেই বসুমতী আফিসে যেতে ব'ললাম, আর সঙ্গে সঙ্গে শেষ পুঁজি পাঁচ টাকার নোটখানাও তার হাতে তুলে দিলাম। তখন এক মিনিটের তরেও ভাবিনি মা!—যে, এত বিশ্বাসের পাত্র আমাদের মোহনলাল—আজ তার সবটুকু বিশ্বাসকে চুরি করতে এসেচে!···টাকা নিয়ে হন্ হন্ ক'রে চলে গেল—যাবার সময় চেঁচিয়ে বললে—পনের মিনিট সবুর করুন রাম-বাবু!—বিজ্ঞাপনের রসীদটা নিয়েই আমি ফিরে আসচি।...কত পনের মিনিট যে শিয়ালদর সেই গাছ তলাটায় কাটিয়ে দিলাম,...মোহনবাবু ফিরে এলো না।...

বললাম—তুমি কেন থানাটাই একবার ঘুরে এলে না বাবা!··· সেখানে কেষ্টাকেও অন্ততঃ দেখতে পেতে!

বাবা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে হাসলেন। বললেন—বাকী কিছু রেখে আসিনি মা! দুর্ব্বল পঙ্গু, গিরি লঙ্ঘনের চেষ্টাও করেছিল!...জোচ্চোর যে, সে কি থানার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের ভরসা রাখে?...কেষ্টও নাই

মোহনও নাই !···কারো কোন খোঁজ তলাস থানার লোক দিতে পারলে না। একটা ডায়েরী লিখিয়ে রেখে, বসুমতী আফিসে গেলাম সেখানেও কোন পাত্তা নাই !...কাগজের সম্পাদক মশায় নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে আমার বিজ্ঞাপন ছেপে দেবেন ব'লে অনেক ভরসা দিলেন, দেশে জোচ্চোর ডাকাতের সংখ্যা পূর্ব্বের চেয়ে হাজার গুণ বেড়ে উঠেচে বলে সাবধানে থাক্‌তে পরামর্শ দিলেন তারপর ফিরে আসার রিক্সা ভাড়া পর্য্যন্ত আমার হাতে গুঁজে দিয়ে, অত্যন্ত অচেনা পর হ'য়েও যথেষ্ট সহানুভূতি দেখালেন।...সংসারে বাস করি, তবু সেখানকার লোক চিন্‌তে পারি নি ব'লে আমার অনুতাপ হ'ল !... ছুরী নিয়ে গলা কাটবো ব'লে ছুটে এলে আজ মোহনকে দেখে হয়তো আমার ভয় হ'ত না, কিন্তু এ ব্যবহার যে জীবনে কারো কাছে লাভ করিনি'!··· যাতে অভ্যস্ত নই, তা বরদাস্ত করি কেমন ক'রে !

আমি একটুও অবাক্ হ'লাম না। বাবাকে সান্ত্বনা আর সাহস দিতে বললাম—অভ্যস্ত হলে কি আর এর জন্যে এত ক'রে ভাবতে হ'ত বাবা ! গা-সহা জিনিসের মর্য্যাদা থাকে না।···মোহনবাবু এক-দিক থেকে আমাদের সতর্ক থাক্‌বার সঙ্কেত দিয়ে গেছেন। সম্বল হারিয়েচি বাবা, কিন্তু বুঝে চল্‌বার সুবুদ্ধি আজ মাথায় ঢুকেচে।

বাবা আক্ষেপের সুরে ব'লে উঠলেন—বুঝে চ'লবি, কিন্তু কি ক'রে চ'লবি সুপ্রিয়া ?...চলার শক্তি কোথা আজ ? খাবি কি ?

ব'ললাম—যখন যা জুটবে ! যদি না জোটে, বাতাস আর জল —এ দুটোকে তোমার চোরে চুরি করবে না বাবা !...চল্লিশ দিন না খেয়েও মানুষে বেঁচে থাক্‌তে পারে।...বেঁচে থাকার সৌভাগ্য কপালে

থাকলে আমরা উপোস ক'রেও তা থেকে বঞ্চিত হব না।...কিন্তু সন্ধ্যে হ'য়ে এলো বাবা!—এইবার ভেতরে যাই চলো।

বাবা আমাকে ধ'রে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। যেতে যেতে শুনলাম—ঘন ঘন তাঁর কণ্ঠ থেকে আকুল প্রার্থনার ধ্বনি বেরুচ্ছে—দুর্গা দুর্গতি-হারিণী মা!—রক্ষা কর—রক্ষা কর—রক্ষা কর।

...কিন্তু সত্যসত্যই দুর্গতিহারিণী মা দুর্গা সেদিন দুর্গতির একশেষ দেখালেন—আবার রক্ষা করতেও কৃপণতা দেখালেন না।

—বারোটা বেজে গেছে।

খোলার বস্তির কোনোখানে কারো সাড়া নাই, শ্রমিক মজুরের দল—কেউ খাটুনির পর বিশ্রামের সময় কেউ বা মদ্যপানের পর নেশার ঘোরে নিসাড়।

জেগে আছি—শুধু আমি!...বাবারও নাক ডাকার শব্দ পাচ্ছিলাম।

রাজ্যের চিন্তা এসে ক্লান্ত মনকে উন্মত্ত ক'রে তুললে!...বড় বড় বিরহী-বিরহিনীর গল্প পড়ে একটা কথা শিখেছিলাম—'অকূলে ঝাঁপ দেওয়া'!...যখন পড়তাম, তখন আপনা হতেই মনে আস্‌তো—এত বড় বিপন্ন অবস্থা বুঝি মানুষের জীবিতকালে আর হ'তেই পারে না!...যার কূল কিনারা নাই এমন দুস্তর পারাবারে ঝাঁপ দেওয়া অথবা ডুবে যাওয়া!...অদৃষ্টের ভীষণ বিড়ম্বনা বই আর কী-ই বা হ'তে পারে!...আজ কিন্তু ভা-রি হাসি এলো!...গল্পে পড়া নায়ক-নায়িকাদের দুঃখে আজ আর প্রাণটা গুমরে কেঁদে উঠ্‌লো না!...হায় রে!—আমার প্রাণের দুঃখ কে বুঝবে আজ?

যারা অনিদ্রায় ভোগে, তাদের সময় কাটাবার সাথী হয় দুশ্চিন্তা, কখনো বা যাতনা!...আমার যাতনা এলো খালি দুশ্চিন্তার অনুগ্রহে।—এই নিঝুম নিরালা পল্লীর মাঝে, অতি ক্ষুদ্র এক পুরাতন বাড়ী ভিন্ন এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মাথা গুঁজে থাক্‌বার ঠাঁই আমাদের কুত্রাপি নেই।...দিন কাটবার নমুনা পেয়েছি—জোচ্চুরীর ছলনা! কখন কোন্ ফাঁকে কে এসে, একমাত্র আঁক্‌ড়ে থাক্‌বার আশ্রয়টুকুও যদি জোর করে কেড়ে নেয়, তা হলে ভাসতে ভাসতে দুনিয়ার কোন্ প্রান্তে গিয়ে ঠাঁই পাবো?

চিন্তার জালখানা টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে ছিঁড়ে গেল—ঘরের মধ্যে আকস্মিক আলোক-রশ্মি দেখে!...যখন সমস্ত আলোক জোর করে নিভিয়ে দেওয়া যায়,—তখন আঁধারই হয় কাম্য,...আলোর জৌলুস আকস্মিক হয়ে দেখা দিলে বাস্তবিকই মনের মধ্যে ভয় ঢুকে যায়।

আলো দেখে আমার বিস্ময় না হ'য়ে ভয়ানক আশঙ্কা হল। কিন্তু আশঙ্কাই আবার মূর্চ্ছাকে ডেকে আন্‌লে—যখন রুদ্ধ দরজাটা আঘাতের ঘায়ে দু'ফাঁক হ'য়ে খুলে গেল!

আমার এতটুকু সাহস নেই যে, চোখ দুটোর পাতা ফাঁক করে দেখি—এমন অঘটন যে ঘটালে, তার শয়তানী মূর্ত্তিটা কেমন!

চোখ বুজে প'ড়ে আছি, বুকখানা ভয়ে দপ্ দপ্ করছে। মেয়ে মানুষ আমি, কিন্তু আজ ভগবানের দিব্যি নিয়ে বলতে পারি—ঢের পুরুষবাবুদেরও অবস্থা আমার চেয়ে কিছুমাত্র ভাল থাক্‌তো না।

—হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দ!

—তাকিয়ে দেখি—বাবার দেহটা বিছানায় ছট্‌ফট্ করছে,—

তাঁর নাকের গোড়ায় একমুঠো তুলো চেপে ধ'রে কে একজন বুকের ওপর ব'সে পড়েচে !

দুজন ছিল—একজনকেও চেনা গেল না।

আমি চীৎকার করে উঠলাম—ওগো !—আমাদের সর্ব্বনাশ হল—বাঁচাও—কে আছো !

বিকট হাসির শব্দ পেলাম—বাইরের উঠোন থেকে।...

তখন বাবা সংজ্ঞা হারিয়েচেন। দেহটা তাঁর অসাড় !—হয়তো আমাকে অকূলে ভাসিয়ে, অনিচ্ছায় তিনি সব ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েচেন।

বড় বড় ডিটেক্‌টিভ নভেলে যে রকম লেখা থাকে, আজ আমাকে তাই-ই প্রত্যক্ষ করতে হ'লো !—

—একজন একটা রিভলভার খাড়া করে আমার সুমুখে এগিয়ে এসে বললে—চেঁচালেই শেষ ক'রে ফেলবো !

হা ভগবান !—শেষ হ'তে কি আর বাকী আছে কিছু ? বেঁচে থাকার সকল রকম উপায়ের সেরা উপায়—আমার পিতৃদেবের দেহ-রক্ষা,—যখন তা-ই চোখের সাম্‌নে ক্ষয় হতে চলেছে, তখন বেঁচে থাকার লাভ কি ? আর থাক্‌বোই বা কি নিয়ে ?

আমার জ্বলন্ত এই চোখ দুটোর সাম্‌নে, তারা অবশিষ্ট যা কিছু আমাদের পুঁজি পাটা ছিল সব গুছিয়ে বেঁধে ফেল্‌লে ! শুয়ে শুয়ে নির্জীবের মত পড়ে পড়ে সব দেখলাম। কিন্তু রিভলভারের ভয়ে নয়,—জীবনে ধিক্কার এসেছিল বলে—বাধা দেওয়ার শক্তি নেই জেনেও, সে শক্তি সঞ্চয়ের ব্যর্থ চেষ্টা করতে আমার বাসনা হ'ল না।

এক একবার মনে সন্দেহ এলো—মোহনবাবুর লীলা-খেলার এ-ও হয়তো একটা অঙ্গ।…কিন্তু ভাড়া-করা লোক দিয়েও কি এত সুশৃঙ্খলায় কাজ আদায় করা চলে?—কে জানে—সন্দেহটা গভীর হতে পারলো না।

অশক্ত, চল্‌বার ক্ষমতাহারা গৃহস্বামীর নজরের সাম্‌নে দিয়েই যেমন শত্রু তার যথাসর্ব্বস্ব ডাকাতি করে নিয়ে পালায়, আজ আমার নজর-টাকেও অত্যন্ত অবহেলা দেখিয়ে এই আততায়ীর দল আমার সর্ব্বস্ব এমন কি হয়তো বা আমার জীবনাধিক প্রিয় পিতৃপ্রাণকেও ডাকাতি করে নিয়ে পালালো!

…ঘরে কেউ নেই!—আবার তেমনি আঁধার। তখন দুশ্চিন্তার সঙ্গে সই পাতিয়ে এপাশ ওপাশ করছিলাম; এখন আকুলতার তাড়নায় অস্থির হয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আলো জ্বাল্‌তে উঠলাম।

কিন্তু সমস্ত আশাকেই যখন প্রতি পদে পদে পদদলিত হ'তে দেখ্‌ছি, তখন এই আলো জ্বেলে বাবাকে শুশ্রূষা করবার অতি ক্ষুদ্র আশা-টুকুও ডাকাতদলের পদতলে দলিত হয়ে গেল!—তারা সব আলো জ্বালার সমস্ত উপকরণ নষ্ট করে দিয়ে গেছে!—এমন কি দেশলাইটা পর্য্যন্ত রেখে যায় নি।—আলো তো দূরের কথা!

ডাক্‌লাম—বাবা!—বাবা!

সাড়া দেবে কে?…তীব্র ক্লোরোফর্ম্মের মহিমায় বাবা অজ্ঞান!

গায়ে হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে হায়রান্ হ'য়ে পড়েছি, তবু সাড়া মেলে নি।

ইচ্ছা হচ্ছিল—ঘরের মেজেয় এই অপদার্থ মাথাটাকে ঠুকে ঠুকে এর

ঘি বের করে দেখি—সত্যি সত্যি সেটা ঘি না আর কিছু !...হাত পা থাক্‌তে, দেহে সামর্থ্য থাক্‌তে যে পঙ্গু পিতার জীবনটুকু ডাকাতের হাতে ছেড়ে দিতে পারে, তার মাথাকে অপদার্থ ছাড়া আর কি আখ্যা দেওয়া যায় ?—সে মাথার ঘি ও যে অনেক কাল গলে উড়ে গেছে—এ-ও নিঃসন্দেহ।

কিন্তু বলিহারি যাই—ভেল্কীর ভোজবাজী দেখে !—

বাইরে দাঁড়িয়ে সেই হতভাগা কেষ্টা ছোঁড়া ! তাই কি শুধু দাঁড়িয়ে ? সাড়া দিলে—দিদিমনি ! শীগ্‌গীর বেরিয়ে এসো ! ঘরে থাক্‌লে আরও হাজারগুণ বিপদে পড়বে।

ভুলে গেলাম যে, কেষ্ট আমাদের বিস্তর টাকাকড়ি ফাঁকি দিয়ে উধাও হ'য়ে গেছলো ! বিপদের উপর এই সমাগত দারুণ বিপদকে আমি কোনো রকমেই উপেক্ষা করতে পারলাম না। ব'ললাম—কিন্তু বাবার যে এখনো জ্ঞান হল না কেষ্ট ! কি করে যাবো ? আর কোথায় যাবো ?

কেষ্টধন বললে—গাড়ীতে বসে বাবুর সেবা করবো আমি। তুমি কিচ্ছু ভেবনা দিদি !···আমি কলকাতায় থাক্‌লে কি আর এমনি ধারা অনিষ্ট ঘটে ! মাসীমার দেওর আমাকে 'ভাল চাকরী দেব' বলে মীরাটে নিয়ে গেছলো। নইলে এতদিন আসি নি কেন !...ট্রেণ থেকে নেমে—বরাবর এতখানি পথ পায়ে চলে আসচি।...কিন্তু আর দাঁড়িয়ে কেন দিদিমনি ? আমি স্বকর্ণে শুন্‌লাম—চারজন লোক তোমার সম্বন্ধেই বিচ্ছিরি কথা কইতে কইতে চলে গেল। শুন্‌লাম—তোমাকে নিয়ে যেতেও তারা অনেক ক'জন মিলে এক্ষুনি আসবে।

ব্যাকুল হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কিন্তু কোথায় যাবো কেষ্ট! এই রাতদুপুরে—কে আশ্রয় দেবে ?

কেষ্ট সহসা আমার একখানা হাত ধরে টান্‌তে টানতে বাইরে নিয়ে এলো। আমি কোন কিছুই বল্‌বার ফুরসৎ পেলাম না।...

বড় রাস্তা—অর্থাৎ আমাদের সরু গলিটা পার হয়ে এলে, যে চওড়া রাস্তাটা পাওয়া যায়—সেখানে সেকেণ্ডক্লাস একখানা ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। কেষ্টধন সে একরকম জোর করেই আমাকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে।

আমি আড়ষ্টের মতই বসে পড়লাম। যখন গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে—তখন চীৎকার করে—ডাকাডাকি করছিলাম—ও কেষ্ট! আমার বাবাকে কোথা রেখে এলি? ওরে—একা রইলেন যে তিনি!—আমাকে......

...ঘর্ ঘর্ ঘর্—গাড়ীর শব্দ—সহরের নির্জ্জনতার বুকে আঘাত করছিল...আমার এই আকুল দলিত বুকখানাই শুধু তার সাড়া পেলে আজ!



* * *
* * *

রাত্রিকালও বটে, তা ছাড়া দ্রুত চলছিল বলে—বুঝতে পারলাম না—গাড়ীখানা কোন্ দিক দিয়ে চলেছে।

আড়ষ্ট ভাব আমার অনেকক্ষণ কেটে গেছে!

মানুষ সহজ আর স্বাভাবিক নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেলে, তার অতীত দুর্ঘটনার সাংঘাতিক মুহূর্ত্তটুকুকে ঠিক ভয়াল করে ভাবতে পারলেও, সেটা তখন তার উপভোগের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়! আমি কিন্তু তেত্রিশকোটী দেবতার নামে হলপ্ করে বলতে পারি—'আজো সেই ভীষণ দুর্য্যোগের রাত্রিটা ভাবতে গেলে আমার সব্ব শরীরের সমস্ত লোপকুপ গুলো শিউরে শিউরে ওঠে! কিন্তু আচ্ছন্নের মত বা মূর্চ্ছিতের মত পড়ে থাকার দুর্ভাগ্য আমি লাভ করি নি, যেহেতু—ভগবানের আশীর্ব্বাদ পেয়েছিলাম।...

গাড়ীর সুমুখের দরজা ফাঁক্ করে দেখ্‌লাম—আমার গাড়ীখানার হাত দশ বারো আগে আগে আর একখানা গাড়ী ছুটে যাচ্ছে!

চীৎকার সুরু করলাম— ওগো! কে তোমরা—আমাকে বাঁচাও!... রক্ষা কর......

হঠাৎ আমার গাড়ীখানা থেমে গেল।

কোচবাক্স থেকে এক লাফে মাটীতে পড়ে, কেষ্টধন এগিয়ে এসে

বললে—চীৎকার করছো কেন? পুলিশে ধরবে যে? জানো—এটা শিয়ালদর মোড়?

আমি কিন্তু কেষ্টর কথায় কাণ দিলাম না। গাড়ী চলার শব্দ থেমে গেছে—এই ফাঁকে প্রাণপণ শক্তিতে ডাক্‌লাম—জোর কোরে আমার সর্ব্বনাশ করছে,—কে আছো রক্ষা কর!

কেষ্ট মিনতির সুরে বললে—রাত দুপুরে আমাকে মিছিমিছি বিপদে ফে'ল না দিদিমনি!···তোমার ভালর জন্যেই—

আমি আগের মতই জোরে জোরে চীৎকার সুরু করলাম—পুলিশ! পুলিশ! পাহারাওলা!

আগের গাড়ীখানা তখন থেমে গেছে। তার ভেতর থেকে একজন ভদ্রলোক লাফিয়ে নেমে, যথেষ্ট দ্রুত আমার সুমুখে এসে দাঁড়ালো!

জিজ্ঞাসা করলে—ব্যাপার কি? কে তোমরা?

—হা ভগবান! আশীর্ব্বাদই বটে! সত্য সত্যই ভগবানের আশীর্ব্বাদ পেয়েছি!···মানুষ দু'হাত যোড় করে অন্তিমকালে ডুক্‌রে কাঁদছে—আমাকে হাতে ধরে এই অন্তিম-বিছানা থেকে উঠিয়ে দাও পরমেশ্বর! মরতে আমার বাসনা নেই!...কিন্তু ভগবানের বদলে স্বয়ং যমরাজ এসে তাঁর অভয় হাত বাড়িয়ে বলছেন—ভয় কি ওঠো! আমার সঙ্গে এসো! আমার বাড়ীই তোমার গন্তব্য করে দেব।...

ঠিক এম্‌নি ব্যাপারই আজ আমার ভাগ্যে জুটে গেল!

—বিপদভঞ্জনের মূর্ত্তি ধরে যিনি সুমুখে এসে দাঁড়ালেন, তিনি মধুসূদন হয়ে এলেন না,—এলেন স্বয়ং মোহনলাল হয়ে।

চিরকাল লক্ষ লক্ষ ব্যাধির করতলগত হয়ে, ধিক্কারময় জীবন নিয়েও

লোকে ব্যাধিকেই হাত বাড়িয়ে ডাকে, তবু যমকে ভজনা করে না। আমি বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। কেষ্টকে ব'ললাম—গাড়ী চলুক কেষ্ট !...যেখানে নিয়ে যাবি আমি সেই খানেই যাবো।

—আর যায় কোথা !

মোহনবাবু পায়ের জুতো খুলে সেই আগের মত আবার কেষ্টা হত-ভাগার পিঠে বেদম্ প্রহার সুরু করে দিলে।

কেষ্ট কাঁদ্‌লে না বা একটা যাতনার কথাও মুখ দিয়ে বের করলে না। যেন কত কাল ধরে সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যই এই শুভ মুহূর্ত্তটুকুর প্রতীক্ষা করে আসছিল।...

মোহনবাবু বললে—হতভাগা শূয়ার ! কার সঙ্গে দল পাকিয়েছিস্ বল্ তো শুনি ?...তার পর আবার জুতোপট্টি···পটাপট্ পটাপট্—না হবে বার পঁচিশেক !

হঠাৎ কেষ্টচন্দর এমন এক ভোঁ দৌড় দিলে—পষ্ট গ্যাসের আলোতেও আমরা তার ঠিক্-ঠিকানা করতে পারলাম না।

আমি গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কেষ্টাকে চলে যেতে দেখে হাসবো না ভাববো—না কি করবো কিছুই ঠিক করে উঠ্‌তে পারি নি।

এমন সময় মোহনবাবু সহসা আমার বাঁ হাতখানা ধরে বললে—চলো আমার গাড়ীতে।

বাঙালীর ঘরের মেয়ে আমি—এই সাফাই গেয়ে আজ আর বলতে লজ্জা নেই যে, গায়ের শক্তি দিয়ে, পিশাচ মোহনবাবুর শক্তিকে আমি পরাস্ত করতে পারলাম না। কিন্তু মনে আমার এত সাহস ছিল,—

আজ যদি ডান হাতে কোনো সদাশয় মহাত্মা একখানা ধারালো ছুরী দান করতেন, তা হলে বাঁ হাতের যে অংশটায় মোহনবাবুর করস্পর্শ হয়েছিল, সেটুকু আমি হাস্‌তে হাস্‌তে কেটে ফেল্‌তে পারতাম।

কিন্তু এ আবার কি শুনি!—

—মোহনবাবু বললে—কেষ্টার জন্যে আমাদের দুর্দ্দশার চরম হয়েচে সুপ্রিয়া!...গাড়ীতে চলো সব বলবো। আর দশ মিনিট অপেক্ষা করলেই আমি এসে পড়তাম।...কিন্তু একটুও ভাবনা করো না, রাম-বাবুকে আমি হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে এসেচি। অজ্ঞান হ'য়েই ছিলেন, কাল সকালে খোঁজ নেব।...উঃ যাকে দুধের ছেলে বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না সেই ছোঁড়ার পেটে পেটে এত কুবুদ্ধি!...ব্যাটা কোন্ দলে যে ভিড়লো সেইটুকুই আমাকে আগে জান্‌তে হচ্চে।...

...এরই নাম মন্ত্রমুগ্ধ হওয়া!...

আমি দিব্যি শান্ত শিষ্ট হয়ে মোহনবাবুর সঙ্গে সঙ্গে তার গাড়ীর কাছে উপস্থিত হলাম।

পকেট থেকে রুমাল বের করে গাড়ীর গদিটা সাফ করতে করতে মোহনবাবু বললে—রামবাবুর কাছ থেকে বিজ্ঞাপনের টাকা নিয়ে, তাঁকে রসীদটা পর্য্যন্ত ফিরিয়ে দেওয়ার ফুরসৎ পাই নি সুপ্রিয়া!—কেবল ঘুরেচি ঐ কেষ্টা ব্যাটার সন্ধানে।...কিন্তু একেই বলে চোখে ধুলো দেওয়া!

গাড়ী তখন ছেড়ে দিয়েচে।

মোহনবাবু বলতে লাগলো—হাজার রকম কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াই, অথচ স্বার্থের গন্ধ একটাতেও খুঁজে মেলে না। খালি অকাজের

কাজ !···আত্মীয় বন্ধুরা পর্য্যন্ত আমার জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছে।··· ছি ছি রাম বাবুর যত দুর্দ্দশার মূল আমিই—অথচ তাঁকে বাপের মত ভক্তি করি, জীবনের সব চেয়ে বড় বন্ধু বলে বিশ্বাস রাখি !

আমার গলাটা বেজায় ধরে গেল। রোদনের ভারে কণ্ঠ চেপে গেছে, ডাক্ ছেড়ে কাঁদবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু পারি না।

মোহনবাবু চট করে সুমুখের আসনটা ছেড়ে, আমার পাশে এসে বসলো, তারপর বাঁ হাতখানা আমার কাঁধের ওপর রেখে ডান হাত দিয়ে চোখ মুছিয়ে দেওয়ার অভিনয় করতে করতে বললে—আমাকে অবিশ্বাস করবে না—এ আমি জানি সুপ্রিয়া !—কিন্তু তবু বলছি—মনে রেখ, দুনিয়ায় আমার মত হিতৈষী বন্ধু তোমার একজনও নেই।

এতক্ষণে আমার বাক্ খস্‌লো।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি বাবাকে হাঁসপাতালে দিলেন কেন ? ···আপনার মত বন্ধু থাক্‌তে বাড়ী বসেই কি তাঁর শুশ্রূষা হ'ত না ?

মোহনবাবু হাস্‌লো। তারপর বললে—বুদ্ধিশুদ্ধির কমতি নেই, তবু তোমাকে ছেলেমানুষ ছাড়া আর কিছু আজ বলতে পারবো না সুপ্রিয়া !···তোমার বাবাকে হাঁসপাতালে পাঠাতে আমারই কি বুক-খানা কেঁপে ওঠে নি ? কিন্তু বিপদের সময় করি কি ? অন্ধকার বাড়ী, চারদিক খাঁ খাঁ করছে—জন মানবের সাড়া নেই, খালি—অজ্ঞান রামবাবুর দেহটা বাইরের রকে পড়ে রয়েচে ! পকেটে দেশলাই ছিল, —জ্বেলে জ্বেলে সব কাঠি গুলো শেষ করে ফেল্‌লাম তবু একটা হ্যারি-কেন কি অন্য কিছুর সন্ধান মিললো না যে, জ্বেলে আগাগোড়া ঘটনা-টার খোঁজ নিই !···চীৎকারে গলা ফেটে রক্ত বেরুলো···সুপ্রিয়া !

সুপ্রিয়া !...ভূতুড়ে বাড়ীর মত চারধার থেকে বিকট হাসির আওয়াজ কাণে এলো !—কোথায় সুপ্রিয়া !—কেউ নেই !...সব অন্ধকার আর নির্জ্জনতার সঙ্গে মাথামাখি হয়ে গেছে !...আমারই অনুগত জন-কতককে অ্যাম্বুলেন্স ডাক্তে পাঠিয়ে, আমি নিজে ছুটলাম—গাড়ীর সন্ধানে।...রামবাবুর নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখেছিলাম নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কোন ব্যাঘাত হয় নি। সুতরাং তাঁর জীবনের জন্য আমার তত চিন্তা হ'ল না। ভাবনায় দিশেহারা হয়ে গেলাম—সুপ্রিয়া! খালি তোমার কি হবে ভেবে!...ফুলের মত কোমল তোমার দেহ, ধর্ম্মের মত পবিত্র তোমার অন্তর, আকাশের মত উদার তোমার মন, না জানি অত্যাচারী পিশাচের হাতে পড়ে কত লাঞ্ছনাই হচ্ছে!... আমি আর মাথা ঠিক রেখে অন্য ব্যবস্থা করবার বুদ্ধি পাই নি। তাড়াতাড়ি লোক জন দিয়ে রামবাবুকে হাঁসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করেই, দশটাকা বক্‌সিসের লোভ দেখিয়ে গাড়ী ভাড়া করেছিলাম।... উদ্বেগের দরুন মনের অবস্থা ভাল ছিল না। নইলে তোমার গাড়ীখানা পার হয়ে এগিয়ে গেছি—তবু টের পাইনি! ভাগ্যিস্ তুমি ডেকেছিলে সুপ্রিয়া! ভগবান সুপ্রসন্ন তাই তোমায় বন্দীদশাতেই আজ উদ্ধার করে ধন্য হলাম।—বলতে বলতে দুখানা হাত দিয়ে, আমার দুখানা হাতকে চেপে ধরলে।

বাধা দিবার সহস্র ইচ্ছা শক্তি মনের কোণে জমা হয়েছিল,—কিন্তু সাহস করে কেউ কাজ দেখাতে পারলে না। তা কি পারে! পরম কারুণিক মধুসূদনের মতই যে ঘোর বিপন্ন অবস্থা থেকে নিরাপদের কূলে টেনে নিয়েচে—তার আদরকে অনাদর করবো—

এতবড় নিষ্ঠুর কৃতঘ্নতা আমার অন্তরে ছিল না। তখনি স্মরণ হল—এইমাত্র মোহনবাবু স্তুতি গেয়েছেন—ধর্ম্মের মত পবিত্র তোমার অন্তর, আকাশের মত উদার তোমার মন!

মনে মনে ঈশ্বরের কাছে কাতর প্রার্থনা জানালাম—ঠাকুর! আমাকে তো কূলে পৌঁছে দিয়েছ, আমার বাবাকে যেন ভাসিয়ে দিয়ো না!

হঠাৎ গাড়ীচলা বন্ধ হয়ে গেল!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—থাম্‌লো কেন?

মোহনবাবু পথের দিকে মুখ বাড়িয়ে জবাব দিলে—আমরা পৌঁছে গেছি। চলো, নামি।......

—ভক্ করে নাকের মধ্যে একটা দুর্গন্ধ ঢুক্‌লো!—উঃ—এ যে আমাদের বেলেঘাটার গলিকেও হার মানিয়ে দিলে!...

মোহনবাবু আমার হাত ধরে, খুব কাছে কাছে করে নিয়ে যেতে যেতে বললে—আমার এক বন্ধুর বাড়ী। তারা সব কাশীতে। বাড়ীখানা একদম খালি আছে, তাই এখানেই নিয়ে এলাম।...বলতে বলতে পকেটে হাত দিয়ে একছড়া চাবি বের করলে।

আমি এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম—আমাদের পিছনে আরও দুজন লোক আস্‌ছিল। সম্ভবতঃ এরা গাড়ীর কোচবাক্সে কিম্বা ছাদের উপর বসে এসেচে। দুজনের একজনকে কি একটা বেয়াড়া নামে ডেকে, মোহনবাবু চাবিছড়াটা দিয়ে দিলে।......

যে রাস্তায় গাড়ী থেকে নেমেছি, সেটার চেয়ে এই গলিটা না হবে আট গুণ কম চওড়া। না আছে আলো, না আছে খোলা বাতাস।

খালি বিকট গন্ধ আর ছুঁচো ইঁদুরের গণ্ডগোল! নিশীথ রাতে পদ-শব্দ শুনে ইঁদুর গুলো ভয়ে ভয়ে আমাদেরই পায়ের গোড়ায় ঝটাপটি করছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম—এ জায়গাটার নাম কি মোহনবাবু?

উত্তর পেলাম—জোড়াসাঁকো।

জিজ্ঞাসা করলাম—বাবাকে কোন্ হাঁসপাতালে পাঠিয়েচেন?

মোহনবাবু এবারেও হেসে হেসে, আমাকে 'কম বুদ্ধি' বলে মৃদু তিরস্কার করলে। তারপর বললে—বিপদ যখন ভয়ানক হ'য়ে ওঠে, তখন সুবিধে-অসুবিধের বিচার চলে না সুপ্রিয়া!...রামবাবুকে আমি ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে ছাড়া অন্য কোথাও পাঠাবার সাহস করি নি। কেননা—বেলেঘাটায় তোমাদের যেখানে বাড়ী সেখান থেকে কোন মরনাপন্ন রোগীকে হাঁসপাতালে পাঠাতে হলে—ক্যাম্বেলই সব আগে পাওয়া যায়। তাছাড়া অ্যাম্বুলেন্স সঙ্গীন অবস্থা বুঝে নিকট জায়গাতেই নিয়ে যায়।

ব্যাকুল হ'য়ে বলে উঠলাম—মরণাপন্ন!!...তবে যে বললেন—জীবনের সম্বন্ধে কোন চিন্তার কারণ নেই?...আপনার পায়ে পড়ি মোহনবাবু! যত বড় সাংঘাতিক হোক্—আমি নিশ্চয়ই সইতে পারবো,—আপনি বলুন!

মোহনবাবু সহসা কোন জবাব দিলে না। তখন আমরা বাড়ীর মধ্যে ঢুকছিলাম।

...বরাবর ত্রিতলে উঠে, একখানা ঘরের দোর-জানলা খুলে দিয়ে, মোহনবাবু বাতি জ্বাললে। তারপর সুমুখের পালকখানা দেখিয়ে

বললে—বিশ্রাম কর সুপ্রিয়া !···আমার বন্ধুর বাড়ী—আমার কাছে পরের বাড়ী নয়, সুতরাং তোমার কাছেও এটা আপন বাড়ী।

দেখলাম—প্রশস্ত পালঙ্ক, পাখীর পালকের মত সাদা ধব্ ধব্ করছে—তার বিছানা !—আট দশটা বালিশ আশে পাশে সাজানো !

আমি কিন্তু থম্‌কে মেঝেয় দাঁড়িয়ে গেলাম। অন্তরটা আমার কি এক অজানা ব্যথার ঘায়ে দুলে উঠ্‌ছিল। কান্না বুক ঠেলে ঠেলে বাইরে আসার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

মোহনবাবু ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বললে—রাত্রি কি আর আছে সুপ্রিয়া ?...বিশ্রাম করো।

আমি দৃঢ় হয়ে বললাম—সত্যি করে বলুন—বাবা বেঁচে আছেন কি-না ?...ভগবানের নাম নিয়ে বলছি—আপনাকে আমি এতটুকু অবিশ্বাস করবো না।

মোহনবাবুও—পাল্টা জবাব দিলে—ভগবানের নাম নিয়ে আমিও শপথ করছি—সুপ্রিয়া ! রামবাবুর জীবনের আশঙ্কা নেই।··· কিন্তু বুদ্ধিমান হয়ে একথা তো তোমাকে মান্‌তেই হবে যে, মৃত্যু ভয় না থাক্‌লেও ভোগান্তির ভয় অনেক রকমেই এসে পড়ে ?... টুটি ছিঁড়ে দিলে মানুষের ভোগান্তি হয় যেমন,—মৃত্যু-ভয় আসেও তেমনি। কিন্তু দেহের এমন ঢের জায়গা আছে, যেখানে আঘাত লাগ্‌লে প্রাণ যায় না বটে, কিন্তু যাতনার আদি-অন্ত থাকে না। ধ'রে রাখো—তোমার বাবার এম্‌নি একটা কিছু হয়েচে। অবিশ্যি সব খবর তোমাকে দিতে পারলাম না।

ধপ্ করে বিছানার ওপর বসে পড়লাম। মাথাটা বন্ বন্

শব্দে ঘুরতে সুরু হয়েছিল। প্রায় দশমিনিটকাল এম্‌নি আচ্ছন্নের মত প'ড়ে ছিলাম—জ্ঞান ছিল কি না—মনে পড়ে না।

সস্নেহে মোহনবাবু ডক্‌লে—সুপি! সুপ্রিয়া!

সাড়া দিলাম বটে, কিন্তু কথা কইতে ইচ্ছা হল না। মা চলে গেছেন—অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে!—কিন্তু আশীর্ব্বাদ দিয়ে গেছলেন—ভবিষ্যৎ-জীবনে আমি অসুখী হব না। সেই মাতৃ-আশীর্ব্বাদের জোরেই অনাথার বেশে মাতুলালয়ে গাঁজাখোর মাতালের গলায় ফুলের মালা দিয়ে 'স্বামী' সম্বোধন করার ভীষণ অনল মুহূর্ত্ত থেকে রেহাই পেয়েছিলাম।—আগুনধারাকে অমৃতধারায় পরিবর্ত্তিত করে, বাবা আমার সুদূর 'বসোরা' থেকে ফিরে এসেছিলেন!···কিন্তু আজ—কে রইলো? কার কাছে ক্ষত বুকের তীব্র শোনিতোচ্ছ্বাস বন্ধ করবার জন্য আমি পাগলের মত ছুটে ছুটে বেড়াবো?

মোহনবাবু কাছটিতে বসে, মাথার চুলের ফাঁকে ফাঁকে হাত বুলিয়ে দিয়ে আগের চেয়ে সস্নেহে—মোলায়েম স্বরে ডাকলেন—সুপ্রিয়া! সু—

আমার যেন মনে হচ্ছিল—আজকের এই অন্ধকারমাখা ক'লকাতা সহর তার বুকের সমস্ত স্পন্দন হারিয়ে ফেলেচে! বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যেন বাতাসের নাম গন্ধ নাই!

সাড়া দিলাম—আমাকে আদর করবেন না! যদি এতটুকু স্নেহ থাকে, তবে টুটি টিপে মেরে ফেলুন। মাকে হারিয়েছি। বাবার আদরে সে শোক সহ্য করবার শক্তি পেয়েছিলাম, কিন্তু এ শোক আমি সইবো কেমন করে?...আমি থাক্‌বো না মোহনবাবু! যদি

নিজে না যেতে পারেন, সদর রাস্তায় বের করে দিয়ে আসুন! এক্ষুনি ক্যাম্বেলে যাবো আমি।...সর্ব্বস্ব যার খোয়া যেতে বসেচে, নরম গদি-অাঁটা পালঙ্কে সে বিশ্রাম করবে—এতবড় ভাগ্যের বিড়ম্বনা কি আপনিই স্বচক্ষে দেখ্‌বেন?

মোহনবাবু নির্নিমেষে আমার রোদন-স্ফীত চোখদুটোর পানে চেয়ে রইলো।

বাড়ীর মালিক হাজির ছিল না বটে, কিন্তু শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম কোথাও নজরে পড়লো না,—যেহেতু—ঘড়িটা পর্য্যন্ত তার চল্‌বার শক্তি হারায় নি!—ঠং ঠং করে তিনবার বাজ্‌লো।

আমি বিছানায় উঠে নীচে বসলাম।

মোহনবাবু তাড়াতাড়ি আমাকে শুইয়ে দিয়ে বললে—যা তাজা, তাকে মলিন করায় অপরাধ আছে সুপ্রিয়া!—সুতরাং আর আমি বিলম্ব করবো না।—তুমি সাবধানে থেক'। দরকার হলে 'লখিয়া'কে ডেকো,—সে আমার বিশ্বাসী চাকর। এই বাড়ীতেই সে থাকবে।... তিনটে বাজ্‌লো, ভোর পাঁচটার মধ্যেই খবর পাবে।

উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—কোথায় যাচ্ছেন?

—ক্যাম্বেলে। বিস্তারিত সংবাদ নিয়ে এসে, তোমাকে প্রফুল্ল রাখাই আমার সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য মনে হচ্ছে।...স্নেহের টান রয়েচে, তাই চব্বিশঘণ্টা বিপদের আশঙ্কা ছাড়া তোমার মনে ভাল চিন্তার ঠাঁই হবে না। নতুবা একটুখানি ভেবে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারতে—দশ-বিশ-পঞ্চাশ—কি দুশো-পাঁচশো রোগীর শুশ্রূষা এবং চিকিৎসার ভার যাদের হাতে, তারা উদাসীন নয়, পাষাণও নয়। হাঁসপাতালের

যত্ন রামবাবুকে অসুবিধায় ফেলে রাখবে না।...এটুকু বিশ্বাস করি বলেই—তাঁকে পঠিয়ে দিয়েছিলাম। নইলে রাস্তা-ঘাটে, কত ছোট-বড় বাড়ীর মধ্যেও কতশত খুন-জখম হচ্ছে, বাইরের লোকে কত তার খোঁজ খবর রাখে?

আত্মহারা আমি,—লজ্জায় সাড়া হয়ে গেলাম। অনুতাপও কম হল না। বললাম—অন্যায় যদি মুখ দিয়ে বেরিয়ে থাকে, তো পায়ের জুতো দিয়ে কেষ্টার হাল আমারও করে দিন মোহনবাবু! ...কিন্তু কেমন করে জানাবো যে, আপনাকে 'পর' ভাবার দুর্ভাগ্য হতে রেহাই পাবার জন্য আমি এখনো ভগবানের কাছে আশীর্ব্বাদ চাইছি। অথচ আপনি রাস্তা-ঘাটের 'পরের' সঙ্গে আমাদের তুলনা করে বসলেন।

মোহনবাবু নিজের রুমাল বের করে আমার চোখ মুছিয়ে দিলে! এবং ঘণ্টাখানেক ধরে কথাব ডালপাল বের করে সাজিয়ে সাজিয়ে ভোর চারটে বাজিয়ে ফেল্‌লে!

পরোপকার-প্রবৃত্তি নিয়ে যারা ঘুরে বেড়ায়, অথবা যাদের দ্বারা মহৎ উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাদের বিস্তর দাবী বা আব্‌দারকে ইচ্ছা না থাকলে অনিচ্ছার সঙ্গেও সহ্য করে নিতে হয়। তাই ঘন ঘন হাতে হাত দেওয়া বা চোখ মুছিয়ে দেওয়ার অভিনয় করলেও, মোহনবাবুকে আমি আপত্তির আঘাতে সজাগ করে দিতে পারলাম না। প্রত্যেক সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে কিন্তু এই দেওয়ার ইচ্ছাটাই আমার সব চাইতে বলবতী হয়ে উঠেছিল।

মোহনবাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বললে—হাসি আসচে বটে, কিন্তু

এ বড় কষ্টের হাসি সুপ্রিয়া !...আমাকে যে এখনো ভুল বুঝে র'য়েচ—এ দুঃখ রাখবো কোন্‌খানে আজ তুমিই তার ঠাঁই বলে দাও !... তোমাদের 'পর' বলে ভাবতে শিখি নি, তাইতো তোমার বাবাকে সাহস করে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি। নইলে সেবা-শুশ্রূষার কথা নিয়ে এতক্ষণ বকে গেলাম কেন ?...কিন্তু আর ভাবনা কেন ? আমি ঘণ্টাখানেক কি বড় জোর—দেড় ঘণ্টার মধ্যেই খবর নিয়ে ফিরে আস্‌চি।

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্‌লাম—আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে চলুন ! বাবাকে যে অনেকক্ষণ দেখিনি আমি !...আর কতক্ষণ না দেখে থাক্‌বো ?

মোহনবাবু—প্রশান্ত হয়ে বললে—ছেলেমানুষী, পাগ্‌লামী, বোকামী—এসব বিপদের সময়ই লোকে বেশী রকম করে দেখাতে যায়।...বুদ্ধি ভ্রংশ হয় কিনা ! সুতরাং তোমাকেও আমি দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু ধৈর্য্যকে অপমান করো না সুপি !—তাতে লোকসান ছাড়া লাভের বিন্দুমাত্র আশা নেই।...আমি তো বল্‌লাম—বড় জোর দেড়ঘণ্টার মধ্যেই খবর নিয়ে ফিরে আস্‌বো ! জেনে রেখ'—মোহনলালের শেষ রক্ত বিন্দুও—খালি তোমারই জন্য......

কথাটা কানের মধ্য দিয়ে যখন ভেতরে প্রবেশ করলো তখন বুঝ্‌তে পারলাম—এ বিশ্রী—এ বেয়াড়া !

...মোহনবাবু তখন সত্যসত্যই চলে গেছে।



ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখ-শোক-দুঃখ সকল অবস্থার পুরোভাগে চিরজয়ীর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়ে জীবনের মধ্যে একাধিপত্য করে—আশা আর কৌতূহল। আজ দুঃখের আবর্ত্তে পড়ে ঘুরণ পাক্ খাচ্ছি, তবু আশাকেও ছাড়তে পারি নি, কৌতূহলকেও দেবে রাখ্‌তে পারি নি।

মোহনবাবুর সম্বন্ধে দু ঘণ্টা পূর্ব্বে আমার যে বিকট ধারণা জন্মেছিল, এখন তা স্মরণে এলে লজ্জায় মরে যাই!—দোষে-গুণে যে ভাল হয়, সে-ই তো আসল মানুষ,—বিশেষতঃ এখনকার দিনে! দু পাঁচটা কথা বল্‌বার ভঙ্গী খারাপ হলেও, ব্যবহারে এতটুকু যার বেচাল দেখ্‌লাম না, তাকে আর যে কেউ সন্দেহ করে করুক—আমি কিন্তু ভালই বল্‌বো। সুতরাং আগেকার সমস্ত ঘটনা, আজ এই দারুণ দুঃসময়ে সাহায্য পেয়েছি বলে ভুলে যেতে ইচ্ছা হল। রত্নাকরবাবুর কল্পিত পরিচয়, ঠিকানা ভাঁড়ানো, টাকা নেওয়া এসবের যে ভবিষ্যতে কোন গুরুত্ব বোঝা যাবে—এমন ধারণা আমার মনে আন্‌তেও সাধ হচ্ছিল না। আমি আজ মোহনবাবুর অকৃপাণ সহায়তায় ভাবীকালে প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মাণ করবো এই আশায় মস্‌গুল্ হ'য়ে রইলাম।…এরই নাম আশা!

…কৌতূহলকেও অপমান করতে পারলাম না। বাবার সংবাদ

আন্‌তে যখন স্বয়ং মোহনবাবু গেছে, তখন নিশ্চিন্ত!...প্রকাণ্ড বাড়ীখানার চার দিক দেখে শুনে বেড়াতে আমার ভা-রি ইচ্ছা হল।

তখনও প্রাতঃকাল হয় নি, তবে ভোরের আলো দেখা দিয়েচে। আমি যে ঘরটায় ছিলাম—তার দক্ষিণ দিক্‌টা একদম ফাঁকা, পাশেই খোলা বারান্দা, কিন্তু দুপাশ দিয়ে অন্য কোথাও যাওয়া চলে না।...

খানিকক্ষণ আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে মুখ খানা নামিয়ে ফেললাম। নক্ষত্রের ম্লানিমা আর প্রভাতী-আলোর ঔজ্জ্বল্য—দু'য়ের মাখামাখিতে আকাশের শোভা বেড়ে উঠেছিল কি কমে আসছিল—সে চিন্তা করবার মত শক্তি আমার মাথায় ছিল না। আমি শুধু শুন্‌লাম—কোন্ এক কল্পলোক থেকে উষার নূপুরের ধ্বনি বয়ে আন্‌ছে—দখিন্ হাওয়ার ঝির-ঝিরে চলন্ত স্রোত!...পাখীর গানে আসর জমে উঠেচে!

উভয় দিকের দরজা পার হ'য়ে একটা প্রকাণ্ড হল ঘরে যাওয়া যায়, সেই হল ঘর পার হলে, তবে ভিতর বাড়ীর বারান্দা এবং নীচে যাওয়ার সিঁড়ি। রাত্রিটা তো দুঃখের ও পরিপূর্ণ হা-হুতাশের ভিতর দিয়েই বিনিদ্র অবস্থায় কাট্‌লো, এখন উষার নুপুর ধ্বনি যেন আমার বাবার কুশল সংবাদটুকু বয়ে আন্‌তে পারে,—প্রভাত-বন্দনায় শুধু এই প্রার্থনাই পুনঃ পুনঃ জানাচ্ছিলাম।......

নীচে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে আস্‌বো—এই মতলবে হল-ঘর পার হয়েই দেখলাম সুমুখের দরজাটা বন্ধ! টেনে দেখি, বাহির দিকে শিকল লাগানো রয়েচে। বার কতক টানাটানি করলাম কিন্তু কেউ খুলে দিতে এলো না।—বাড়ীতে আমি ছাড়া যে দ্বিতীয় মানুষ

আছে—সেইদিকেই তো যথেষ্ট সন্দেহ ছিল! লোকজন না থাকার সংবাদ একটু আগে মোহনবাবুর মুখ থেকেই শুনতে পেয়েছিলাম—তা-ও মনে পড়ে গেল।...কিন্তু উপায় এখন!...

বিষাদের বিশাল তরুর ডালপালা গুলো নড়-বড় করে নড়ছিল তখন।...গোড়ার দিকও ঠিক সোজা হ'য়ে খাড়া ছিল না।...সন্দেহ নানারকম বীভৎস রূপ ধরে যখন মনটাকে কালো করে দিতে এলো,—তখনই বিরুদ্ধ শক্তি নিয়ে দাঁড়ালো—রাশি রাশি যুক্তি-তর্ক!...মনে হ'ল—আমাকে নিরাপদে থাকতে দেওয়ার জন্যই মোহনবাবুর এতদূর সতর্কতা, অথবা কপালের কথা বলা যায় না,—যদি নির্জ্জনপুরীতেও দস্যু-তস্কর, অথবা আমাদের কেষ্টধনবাবুরই শুভাগমন হয়, তা হলে একা অসাবধান হয়ে থাকার সুখটুকু একদণ্ডেই বেরিয়ে যাবে!...লোকটার বাস্তবিকই চারধারে রকম-বেরকমের বুদ্ধি যোগায়। মোহনবাবুকে আমার নিন্দার বদলে ভক্তি উপহার দিতে ইচ্ছা হ'ল। আমি খুব আস্তে আস্তে দক্ষিণের খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

কিন্তু 'বড় জোর দেড় ঘণ্টা দেরী হবে' বলে—এখনো মোহনবাবু ফিরলো না কেন?...বুকখানা ধক্ করে উঠলো। মনে মনে বললাম—হে ভগবান!—আমাকে সকল কিছুই সইবার জন্য একদম্ মরিয়া করলে না কেন?

সরু অন্ধকার গলির মধ্যে বাড়ী, কিন্তু পুব ধারের একটা ফাঁকা জায়গার অনুগ্রহে সোণালি প্রভাত-সূর্য্যের আভা আসছিল।

মনের সমস্ত ঠাঁইটুকু চিন্তায় চিন্তায় ছয়লাপ হয়ে গেল।...

—কিন্তু ও আবার কি!...ছেলে বেলায় মার-মুখে অনেক ভূতুড়ে গল্প শুন্‌তাম। এই সেদিন মামার বাড়ীতেও পাড়ার বুড়ী ঠান্‌দির মুখে বিনা ঝড়ে আশথ্‌ গাছ উপড়ে যাওয়ার কথা শুনেচি!... এবাড়ীটাও ভূতুড়ে নয় তো!

খিল্‌ খিল্‌ হাসি—দুপ্‌ দাপ্‌ শব্দ...বাড়ীখানা যেন তোলপাড় হয়ে উঠলো! অথচ শুন্‌তে আমার একটুও ভুল হয় নি—মোহন-বাবু বলেছিল—তার বন্ধু কাশীবাস করছে—এখানে জনমানবের বসবাস নেই।

দেখ্‌লাম—আমার ঘরখানা ধোঁয়ায় ভরে গেছে। কানে শুন্‌লাম—কলের জল পড়া, বাসন ধোয়ার আওয়াজ—এম্‌নি ধারা কত কি!

একালের সভ্য-ভব্য মেয়ে আমি। ইংরাজী ইস্কুলে পড়েছি, অনেক শিক্ষিত মহিলার সঙ্গে মেলামেশাও করেছি—তবু ভুতের ভয়কে এই দিনের আলোতে এড়িয়ে যাবার সৎসাহস পেলাম না। খাটের বিছানাটায় একসঙ্গে দুতিনটে বালিশের ফাঁকে মুখখানা গুঁজে নির্জীবের মতই শুয়ে পড়লাম।

বুকে তখন লক্ষ হাতুড়ি পেটার আওয়াজ সুরু হয়েচে!

কতক্ষণ আচ্ছন্নের মত পড়েছিলাম—বাহ্য জ্ঞান ছিল কি ছিল না তা-ও মনে পড়েনা। মোহনবাবুর ডাকে ধড়্‌ মড়্‌ ক'রে উঠে বস্‌লাম।

জিজ্ঞাসা করতেও ভয় হচ্ছিল, পাছে বাবার আমার মন্দ খবর কিছু কানে শুন্‌তে হয়!

মোহনবাবু বললে—ভয় কি সুপ্রিয়া! রামবাবু ভালই আছেন। সামান্য সামান্য জ্ঞান হয়েচে।

আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম—কতক্ষণ ছিলেন তাঁর কাছে? কি বল্লেন?···আমার কথা বলে এসেচেন?

মোহনবাবু জবাব দিলে—ডাক্তারের নিষেধ, তাই কথাবার্ত্তা হ'ল না কিছু। সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।···মস্তিষ্কে হঠাৎ আঘাত লেগেছে, পূর্ব্বের জ্ঞান ফিরে আসতে অন্ততঃ পাঁচ সাত দিন বিলম্ব হবে।··· কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করছো তো সুপ্রিয়া?

মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো!—হ্যাঁ—বিশ্বাস—তা করছি বইকি! বল্লাম—আমি তো বলিনি—যে আপনাকে আমি অবিশ্বাস করি?

—তবে জেনো রাখো—রামবাবুর জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ। তা ছাড়া অর্ডিনারি রুগীদের মতই আমি তাঁকে রেখে আসি নি। দস্তুর মত অবস্থাপন্ন লোকে যে ভাবে হাঁসপাতালে থাকেন আমি ঠিক সেই ব্যবস্থা করে এসেচি।...ত্রুটীর কিছুমাত্র আশঙ্কা করো না।

আমি চট্ করে মোহনবাবুর দুটি পায়ে হাত রেখে মিনতি করলাম —তবে এক্ষুণি আমাকে নিয়ে চলুন। যাঁকে এক মিনিট বাইরে পাঠিয়ে আমার চিন্তার অবধি থাক্তো না, তাঁকে যে অনেকক্ষণ দেখিনি মোহনবাবু! আর আমি সহ্য করতে পারবো না।···বাবাকে না দেখে আমি বাঁচবো না মোহনবাবু!

আমার মাথার ওপর গভীর স্নেহে একখানি হাত রেখে মোহন-বাবু বললে—ভেব'না সুপ্রিয়া!—সময় হলে অবশ্যই তোমাকে নিয়ে যাবো। ডাক্তারের নিষেধ—তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হলে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে।

—তার কারণ ?

—কারণ—জ্ঞান হচ্ছে আবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন।...জ্ঞানের সময় তোমাকে দেখে, হয়তো মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটতে পারে।...মানুষের পক্ষে ঈশ্বর যা করেন—মঙ্গলের জন্য—এই কথাটা যেমন বল্‌বে, রুগীর সম্বন্ধেও ডাক্তারে যা বলেন মঙ্গলের জন্য কথাটা ঠিক তেম্‌নি করে বল্‌তে হবে সুপ্রিয়া! নইলে রুগীকে কদাচ বাঁচানো যাবে না। বেশী না—আর দুটো দিন চোখ বুজে থাকো,—তিন দিনের দিন ভোরে তোমাকে নিয়ে যাবো।...ডাক্তার বলেছে—যতক্ষণ না রুগী আপনা হ'তে তোমাকে খোঁজ করেন, ততক্ষণ তোমার যাওয়া চলবে না।

আমি উদ্বিগ্ন হয়েই জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—ভয় নেই—সত্যি ?

—একটু আগেই তো বল্‌লাম—সুপ্রিয়া!—যে, আমাকে বিশ্বাস কর কি না,...যদি অবিশ্বাস আসে, চলো,—নিয়ে যাই।...যদি পিতৃ-হত্যার পাতকভাগী হওয়াই তোমার অদৃষ্টলিপি হয়, তা হলে সাধ্য কি যে আমি খণ্ডন করে রাখি!...কি এমন স্বার্থ ছিল আমার সুপ্রিয়া!—যে রাতদুপুরে অগুন্তি বদ্‌মাইস গুণ্ডার লাঠিকে অগ্রাহ্য করে তোমায় উদ্ধার করে আন্‌লাম ?...রামবাবু, তুমি—কী এত আপন জন আমার ?...তার পরই সহসা আত্মগত হয়ে বল্‌তে লাগলো—আপন হতেও আপন!—জানি না কি চোখে তোমাদের প্রথম দেখা দেখেছিলাম।

আমি অভিভূত হয়ে পড়্‌লাম।...বা—বা—মোহনবাবু এত ভাল! দেবতা আর কাকে বলে জানি না!...একান্ত বশীভূতার

মতই তার দু'খানা হাত চেপে ধরে ব্যগ্র হয়ে বল্লাম—আপনার পরামর্শ ছাড়া এক পা-ও চলবো না আমি। আপনার উপদেশই হবে আমার সম্পদে বিপদের একমাত্র সহায়।...কিন্তু একটা কথার জবাব দিন মোহনবাবু!—সন্দেহের দোলায় দোল খাচ্ছি আমি।

মোহনবাবু স্মিতমুখে বল্লে—একটা কথা কেন সুপি!—এক লক্ষ কথারই জবাব দিতে আমি সতত প্রস্তুত হয়ে রইলাম।—কি বলবে বল?

—আপনি বলে গেলেন—বাড়ীখানা আপনার এক বন্ধুর, এবং তিনি সপরিবারে কাশীতে রয়েচেন। জন-মানব এখানে বসবাস করে না। কিন্তু সকাল হতে হতেই সারা বাড়ী জুড়ে নানারকম শব্দ, হাসি, হট্টগোল, এর মানে কি? আমার কিন্তু বেজায় ভয় করে।

হোঁ হো করে মোহনবাবু হেসে উঠলো। বললে—তোমার কথা একটুও মিথ্যে নয় সুপ্রিয়া! বাড়ীর ইতিহাস তোমাকে আমি যা দিয়ে গেছি, তাতে হঠাৎ এই গোলমাল শুন্‌লে, মানুষ তো দূরের কথা —দৈত্য-দানবও ভয় খেয়ে মরে।—ভূতকে অবিশ্বাস করার দুঃসাহস আজকাল কোন সভ্য সমাজেই চল্‌ছে না কিনা। আসল কথাটা বলি এখন,—সাড়ে পাঁচটার সময়—আমার বন্ধুটির দুই শ্যালিকা আর দুটি মামাতো বোন্ কোনো খবর না দিয়েই মধুপুর থেকে চলে এসেচে। এরা জান্‌তো না যে, যাদের কাছে আস্‌চে—তারা ক'ল-কাতায় নেই।...নীচের ঘরে যে লোকটাকে বসিয়ে রেখে গেছলাম, তার মুখেই সব কথা শুনে, বেচারীরা ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু লোকটা বোকা নয়, তাই সঙ্গে সঙ্গে ঘর-দোরের চাবি খুলে দিয়েছে। চাবি-

ছড়া আমি তার কাছেই রেখে গেছলাম।...দূর পথ থেকে সারা রাত 'ট্রেন-জার্ণি' করে, ভোরের বেলায় ঠিকানায় পৌঁছুলে লোকে সাধারণতঃ একটুখানি গণ্ডগোল হাসি খুসী করেই থাকে। সুতরাং—মাভৈঃ! এটা ভূতের বাড়ী কদাচ নয়।

লজ্জিত হলাম আমি।

খানিকক্ষণ চুপ্ চাপ্ থেকে, জিজ্ঞাসা করলাম—তাঁরা সব কি করছেন?

—কি জানি। আমার সঙ্গে বিশেষ কারো পরিচয় নেই। তবে জানাজানি আছে এই পর্য্যন্ত। সম্ভবতঃ এসে এসেই ঘুমুতে সুরু করেছে। কেন বল দেখি?—এত খোঁজ নিচ্ছ যে?

—এম্‌নি। অন্য কারণ নেই।

—চাকরটার কিন্তু বুদ্ধি সুদ্ধি সাধারণ নয় সুপ্রিয়া!—শুন্‌লে তুমি আশ্চর্য্য হয়ে যাবে,—ব্যাটা চারজনকে চারখানা পৃথক্ পৃথক্ ঘর খুলে দিয়েছে। অতিথিরাও তো যে সে নয়,—সাক্ষাৎ গৃহস্বামীর বিশিষ্ট আত্মীয়া!—ব'লেই জোরে হেসে উঠলো।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছাড়তাম, যদি ব্যবস্থা করে দেন—

ব্যস্ত হয়ে মোহনবাবু সেই ঘর থেকেই একটা প্রকাণ্ড চামড়ার সুটকেস খুলে একখানা শাড়ী, একটা জ্যাকেট, সামিজ সব বের করে ফেল্‌লে।

—আমি অবাক্ হয়ে দেখছিলাম।

বল্‌লে—সেই যে গরীবের মেয়েটা—যার বিয়ের জন্য তোমাদের

সঙ্গে টাকা নিয়ে এলাম, এসব তার জন্যেই কেনা হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যিস সব গুলোই তাকে দিয়ে ফেলি নি···আজ এই শাড়ী-জ্যাকেট গুলোর জন্ম সার্থক হ'য়ে গেল সুপ্রিয়া !—

মোহনবাবুর সব ভাল—খালি এইখানটিতে প্রচণ্ড দোষ !...সময় সময় কি যে ব'লে ফেলে !

শাড়ী-জ্যাকেট ইত্যাদি হাতে নিয়ে আমি বাইরে যাবো,—মোহনবাবু বললে—সকল সময় মানুষের স্পর্দ্ধা ভাল নয় সুপ্রিয়া !···এ তোমার অচেনা জায়গা !

আমি সামান্য হেসে বললাম—কিন্তু বন-জঙ্গল নয়। কোথায় কি আছে তা দেখে নিতে পারবো। আপনি বসুন,—ব্যস্ত হ'তে হবে না।

মোহনবাবু কিন্তু বসলো না। চটীজুতো পায়ে দিয়ে আমারই সঙ্গে বাইরে আস্‌তে আস্‌তে বললে—একটা উড়ে বামুনকে ধরে নিয়ে আসি। রান্না-খাওয়ার যোগাড় করতে হবে তো !

এই দুটো কথার ওপর আমার বিতৃষ্ণা এসে গেছলো। বাবার বিপন্ন অবস্থার কথা যেমন একদণ্ডও ভুলে থাক্‌তে পারছিলাম না, তেমনি রান্না-খাওয়ার যে বাস্তবিকই প্রয়োজন আছে—এই সব চেয়ে বড় কথাকেও সত্যসত্যই বড় বলে মেনে নিতে আমার ইচ্ছা হচ্ছিল না। ছার প্রাণ !—গেলেও আমার দুঃখ নেই !

সুতরাং রান্নার জন্য মোহনবাবু উড়ে ঠাকুর ধরতে চলে গেল—আমি আপত্তি করলাম না।......

...নীচের কল-ঘর থেকে স্নান শেষ করে বেরিয়ে আসচি, সেখান

থেকেই ভেতরের রান্না-ঘরটা নজরে পড়লো। দেখলাম—উড়েবামুন উৎসাহের সঙ্গে রান্না স্থরু করেছে। বুঝতে পারলাম—আমার সঙ্গে রান্না খাওয়ার আলোচনা করবার ঢের আগে থেকেই সকল ব্যবস্থা ঠিক করা ছিল। বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত অতিথি!

মোহনবাবুর ওপর ভক্তির মাত্রাটা আর একধাপ্ উঁচুতে উঠলো।

সিঁড়িতে উঠ্তে যাবো—একটি মেয়ে ত্রিতলের ঘর থেকে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌লে।

কিন্তু দ্বিতলে উঠে, ত্রিতলে উঠবার সিঁড়ির কাছাকাছি আস্‌তেই হঠাৎ মোহনবাবু ডাক্‌লে!

—ফিরে এলাম।

বললাম—বিশেষ কিছু দরকার আছে কি? ওঁরা আমায় ডাক্‌ছিলেন কিন্তু।

বিস্মিত মোহনবাবু বলে উঠলো—বল কি স্থপ্রিয়া! একবার দেখা হতে হতেই ডাকাডাকির পালা স্থরু করে ফেলেচ! কিন্তু সব আগে চা খেয়ে নাও। সমস্ত রাত্রি জেগে কেটেছে...বাঁচতে হবে তো!

এই বাঁচা না বাঁচার কথায় মনের ভেতর অনেক রকম তর্ক করবার ঝোঁক এলেও, আমি কথা কাটাকাটি করলাম না। আমার তখন সমস্ত মনটা তেতলার সেই অতিথির ঘরে যাবার জন্ত ছট্‌ফট্ করছিল। ব'ললাম—চা আমি জীবনে খাই নি মোহনবাবু! আপনি খান, আমি ঘুরে আসি।

মোহনবাবু ব্যস্ত হয়ে বললে—তবে পাঁচমিনিট সবুর কর, জল-খাবার আনিয়ে দিচ্ছি, না খেয়ে তোমার যাওয়া হবে না।...

আজ বাবা নেই কাছে—সেই দুঃখেই সারা হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এতখানি স্নেহের অধিকার নিয়ে মোহনবাবুকে তো আর কোনদিন কথা বল্‌তে শুনি নি! ব্যথার জ্বলন্ত আগুনে আজ সুধার ধারা ঝর্‌লো! একা আমি—এই ব্রহ্মাণ্ডের দুয়ারে, তবু হয়তো নিরাশ্রয় হওয়ার দুর্ভাগ্যকে বরণ করতে হবে না—প্রবল এই সান্ত্বনা!

বললাম—আচ্ছা খাবার আসুক না—আমি ঘুরে আসি।

অধিকারের দাবী নিয়ে মোহনবাবু বলে বসলো—খেয়ে নিয়েই ঘুরতে যেয়ো, তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।...কাল সমস্ত রাতটা তোমার জন্যে ভুগ্‌তে হয়েচে, এর পরও যদি খাওয়ানো-ঘুমপাড়ানোর বালাই পোয়াতে হয়, তাহ'লে সত্যি বল্‌চি—ওসব পরের ব্যথায় আর মাথাব্যথার জ্বালা সইবো না।

আমি যে দুঃখী—এ কথাও মনে রইলো না। হাস্‌তে হাস্‌তে পাশের একখানা চেয়ারের ওপর বসে পড়লাম।

মোহনবাবু ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বললে—আমার মনে হয়, ওদের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে তুমি সুখী হবে না।...

আমার বিস্ময় বোধ হল। জিজ্ঞাসা করলাম—তাই বুঝি যেতে নিষেধ করছিলেন? কিন্তু কেন সুখী হব না?

—দুটো কথার জবাব দিতে হলে অনেকক্ষণ দেরী হবে সুপ্রিয়া! জলখাবারের লোভ দেখিয়ে তোমাকে আমোদ করার সুখ থেকে বঞ্চিত

করলাম, আগে তারই বন্দোবস্ত করি।...কিন্তু সত্যিই—তুমি সুখী হতে পারবে না জেনে,—যেতে নিষেধ করেছিলাম।

আমি বললাম—আমাদের ইস্কুলে, যখন তখন মেয়েরা ছড়া কাটতো—

যে বুঝেচে সে মজেচে—
যে না বুঝ্‌লো—থাক্‌লো, ভালো,
কিন্তু আধা বুঝে পরাণ গেলো।

এত যে স্নেহ যত্ন করছেন,—কিন্তু আধা বুঝে পরাণ যাওয়ার পরিণাম দেখ্‌তেই কি আপনার বেশী ভাল লাগ্‌বে?...আমাকে বলতেই হবে। আমি ছাড়বো না মোহনবাবু!

মোহনবাবু গম্ভীরভাবে বললে—ওরা সব বড়লোকের মেয়ে, আমরা গরীব,...কথায় কথায় এত এত টাকা পয়সা আর দামী দামী কাপড় গয়নার অহঙ্কার,—এর নাম যদি আমোদ হয় সুপ্রিয়া, তাহ'লে সত্যি বলছি—আমার একটুও নিষেধ নেই, তুমি সচ্ছন্দে আমোদে যোগ দাওগে।...আমি তো আগেই বলেছি—জানা শুনো আছে কিন্তু মাথামাথি ভাব সাব নেই; নেই শুধু এরই জন্যে। ছোট মুখের বড় কথা আমার সহ্য হয় না সুপ্রিয়া! বোনাইএর টাকায় পৃথিবী-ভ্রমণ আর কেল্‌নারের হোটেলে বসে চপ-কাটলেট ভক্ষণ, এ ব্যাপারটা অন্ততঃ আমাদের দেশে খাপ্‌ খায় না। বিশেষতঃ হিঁদুর ঘরে! সভ্যতার আলো যতই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ুক সুপ্রি! তবু-এ ভারত, ইউরোপ নয়। তা ছাড়া ওদের অন্য স্বভাব-চরিত্রকেও আমি সতী-লক্ষ্মীদের স্বভাবের সঙ্গে তুলনা করবো না।

আমি আর কিছু শুনতে চাইলাম না। চেয়ারখানা ছেড়ে দিয়ে

সটান খাটের ওপর শুয়ে পড়লাম। মনটা কি রকমধারা গণ্ডগোলে পড়ে গেল।......

*** ঠিক পাঁচটা বেলায় মোহনবাবু বাইরে যাওয়ার জন্য সাজ্‌গোজ করছিল।

আমি বল্‌লাম—কোথায় যাবেন ?

—রামবাবুকে একটিবার দেখতে যাবো। তারপর মেসেও যেতে হবে। আজ কদিন থেকেই যা ব্যাপার চলেছে, তাতে ম্যানেজার খাতায় নামটা পর্য্যন্ত কেটে দিলে কি না কে জানে!

আমি আর সুযোগ হারালাম না। জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কিন্তু ঠাট্টার লোভটা আমার দিক দিয়েও সাম্‌লাতে পারেন নি মোহনবাবু!...আমি কিন্তু এ রকমধারা ঠাট্টা তামাসা উচিত বলে মান্‌তে পারি না।

মোহনবাবু—বিস্মিত না হ'য়ে—অল্প অল্প হাস্‌তে লাগ্‌লো। ব'ললে—দুনিয়ায় কারণ ভিন্ন কাজ হয় না সুপ্রিয়া! এতটুকু কিছু নেই যা বিনা কারণে ঘটতে পারে। দরকার আর উচিত মনে হলে—বাপ-মাও—মেয়েকে তামাসা করতে পারেন।

বলতে বলতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে—কিন্তু সেরকম সাংঘাতিক... নাঃ এ তুমি ভুল বলচো সুপি!—তারপর হাস্‌তে হাস্‌তে বলে উঠ্‌লো—মিথ্যা কথা কহিও না,—মিথ্যা কহা মহা অপরাধ।...

চাণক্য পণ্ডিত তাঁর পুঁথিতে লিখে গেছেন—'মা ব্রুয়াৎ-সত্যম্‌ অপ্রিয়ম্‌...মেসের ঠিকানা, এবং রত্নাকরবাবুর সম্বন্ধে অনেক কথাই বলবো ভেবে, অনেক রকমের প্ল্যান তৈরী করেছিলাম। কিন্তু বুঝ্‌তে

পারছি,—সময়ের ফেরে মনের কথা মনেই পুষে রাখ্‌তে হবে। ভুল ভ্রান্তি দেবতাদেরও হয়ে থাকে, সুতরাং মোহনবাবুরই বা এমন কি বিশেষ অপরাধ!

ঠাট্টা-তামাসার আলোচনাটুকু বন্ধ করবার ইচ্ছায় বল্‌লাম—আপনার সঙ্গে আমিও যাই না কেন? যদি সময় হয়, আর ডাক্তার-বাবুরা অনুমতি করেন, তাহ'লে দূর থেকে একটিবার বাবাকে দেখে আস্‌বো।

বিরক্ত হয়ে মোহনবাবু বলে উঠলো—অবাধ্য হয়ো না সুপ্রিয়া! সামান্য দু'একটা দিনও যদি সবুর না সয়, তাহ'লে আমার সঙ্গে চলো, ধর্ম্মতলার দোকান থেকে একটা বন্দুক না হয় পিস্তল কিনে দিচ্ছি, হাঁসপাতালের ঘরে ঢুকে, বাপের বুকে গুলি চালিয়ে এসো।...

হা ভগবান! সুখের সৌধ তৈরী করবার এ ব্যর্থ সাধকে কেন তুমি মনের কোণে ঠাঁই দিতে সাহস দিয়েছিলে!

এ কথার পর আর কি অন্য কথা বল্‌বার স্পর্দ্ধা থাকে? না—থাকাই উচিত? মাথা হেঁট হয়ে গেল। অবাধ্য অশ্রু আমার বাধার সঙ্কেত শুনতে চাইলো না।

মোহনবাবু তখন কণ্ঠে অনেকখানি স্নেহ ছড়িয়ে বললে—খুব সাবধানে থেক!...ফচ্‌কে মাগীদের সঙ্গে মেলামেশা করো না।...টাকাপয়সার যদি দরকার হয়—বলেই পাঁচটা খুচ্‌রো টাকা বিছানার ওপর রেখে, বললে—নিজের ভেবে খরচপত্র করো। নীচে আমার চাকর রইলো। কিন্তু সাবধান—খুব সাবধান সুপ্রিয়া! যদি বন্ধু বা হিতৈষী বলে আমাকে ভাবতে পেরে থাকো, তাহ'লে

অনুরোধ করে যাচ্ছি—বাইরে বেরুবার সাহস করো না। এ পাড়া ভাল নয়।

আমি নতমুখে বসে ছিলাম। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কখন ফিরবেন ?

মোহনবাবু তখন ঘরের দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে গেছে, জবাব দিয়ে গেল—ন'টার বেশী হবে না।



উপরের ঘরে গান হচ্ছিল—ঠিক তখন সন্ধ্যাবেলা।

মোহনবাবুর হাজার নিষেধকে আমি কেন যে সকল সময় মান্য দেখাতে পারছি না—তাই ভাবছিলাম। তিনি আমার পরম হিতৈষী বন্ধু,—কতবার কতরকম করে বলে গেলেন—'বড়লোকের মেয়ে—চরিত্রহীন—ওদের সঙ্গে মিশো না'—তবু কেন সাধ যায়—ওদের ঘরে অন্ততঃ একমিনেটের তরেও ঘুরে আসি! নষ্টচরিত্রা হোক্, দাম্ভিক হোক্—কিন্তু মানুষ তো!—তা ছাড়া গায়ে পড়ে আমার যাওয়া নয়—যাবার জন্যে সকাল বেলায় সাদর নিমন্ত্রণ পেয়েছি।

কিন্তু আরও একটা দেখচি,—মোহনবাবু না হয় আমাকে বারণ করে দিলেন,—ওরা কেন একটিবার ডেকেই নীরব হয়ে রইলো! হ্যাঁ নিশ্চয়ই দাম্ভিক, নিশ্চয়ই ভেতরে দস্তুর মত গলদ্ আছে। যাক্ গে—ওদের অহঙ্কার নিয়ে ওরাই থাক্—আমি আমার আপন হিতৈষীর অপমান করবো না।...মনে মনে অভিমান হল! অথচ তখনি ভাবচি—এ অভিমান ওদের মনে হওয়া—সে-ওতো আশ্চর্য্য নয়! কিন্তু ওরা যে অতিথি,—গৃহস্বামীর সম্ভ্রান্ত অতিথি!......

ভাবনায় ভাবনায় আমাকে দিশেহারা করবে দেখচি। কতশত এলোমেলো চিন্তা যে মনটাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে—তার সীমা সংখ্যা নাই।

বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চাকরটাকে ডাকবো—কিন্তু এমনি বোকা আমি—তার নামটা পর্য্যন্ত জেনে নিই নি।

ঘড়িতে আটটা বাজলো। ভেবে ছিলাম—চাকরটাকে দিয়ে ডাকঘর থেকে একখানা খাম কিনে আনাবো। রত্নাকর বাবুকে সংবাদ না দিলে, ঠিক মানুষের মত কাজ হবে না।…তাঁকেও আমি আজ পরম সহায় বলে মনে করি।

…সিঁড়িতে কার পদশব্দ পেলাম।

…একমিনিটের মধ্যেই মোহনবাবু ঘরে ঢুক্‌লো।

তাড়াতাড়ি উঠে, জিজ্ঞাসা করলাম—দেখে এলেন? বাবা কি করছেন—জ্ঞান হয়েচে?

—হ্যাঁ—আজ সমস্ত দিনে, গড়ে—প্রায় তিনঘণ্টা সজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন।

—ডাক্তারবাবুরা কি বললেন?—কতদিনে সারবে?

—সারতে দেরী হবে সুপ্রিয়া! তবে তাঁরা খুব সাহস করে জানালেন—ভয় নেই—

—আমাকে খোঁজ করেন নি? যখন জ্ঞান ছিল—তখন কি কি কথা বলেছিলেন?…আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হল? তখন জ্ঞান ছিল?

—হ্যাঁ প্রায় ঘণ্টাখানেক আমি তাঁর কাছে ছিলাম। তার মধ্যে একবার অজ্ঞান হয়েছিলেন। প্রায় বিশ মিনিটকাল কথা কয়েছেন। তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা কিছুদিন স্থগিত রাখতে হবে—একথা ডাক্তাররাই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। জিজ্ঞেস্ করলেন—সুপি কেমন আছে—তুমি তাকে ভাল রেখ—ইত্যাদি…

বাবাকে না দেখার জন্য অশান্তির অন্ত ছিল না, তবু এই আমার ঢের সান্ত্বনা। ভাগ্যহতার ভাগ্যে ভগবান এর চেয়ে আর কত সুখ পুরস্কার দেবেন?

* * * রাত্রির আহারের ব্যবস্থা হ'ল গুরুতর।

এর জন্যে আমি মোহনবাবুকে ভর্ৎসনা করতেও ছাড়লাম না। কিন্তু সে বললে—আজকে যদি ভাল খাওয়া দাওয়া না করবে, তবে কবে করবে সুপ্রিয়া? শুভ সংবাদ পেলে অথবা শুভ কাজের সূচনা হলে—মানুষ ভালমন্দ খায়—আনন্দ করে। যে মানুষকে যমে নিয়ে টানাটানি করছিল,—সে আজ কপালগুণে যমপুরীর দোর গোড়া থেকে ফিরে এসেচে.—এর চেয়ে সুসংবাদ আমাদের কি হতে পারে?

কিন্তু আয়োজনও বড় কম নয়।—সন্দেশ রসগোল্লা তো ছিলই, তা ছাড়া মাংস চপ্ কাটলেট্ অবধি বাদ পড়ে নি।

মোহনবাবু আরও বললে—চপ্ কাটলেটের অয়োজন আজ করতেই হ'ত সুপ্রিয়া! যেহেতু—বাড়ীতে সম্ভ্রান্ত অতিথি! তবে আমরা যে মুখে দিচ্ছি, এ শুধু রামবাবুর রোগমুক্তির সূচনা পেয়ে.।

মন সম্পূর্ণ রকমে স্বীকার করতে না চাইলেও, নিতান্ত অস্বীকারের ঝোঁক দেখালে না।......

...রাত্রি দশটার আহার শেষ হয়ে গেলে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম —ওঁদের খাওয়া হল? কোন্ ঘরে খেলেন?

মোহনবাবু বললে—রাজা মহারাজারাও পায়ে হেঁটে চলা ফেরা করে সুপ্রিয়া, কিন্তু এরা সব রাজা বাদশার 'মাদার টিঁন্চার!'…কিন্তু আর

না…দিনের বেলাতেও বোধ হয় তোমার ঘুম আসে নি। সকাল সকাল শুয়ে পড়ো। ঘুম না হলে শরীর আরো খারাপ হবে।

আমার শরীর কিন্তু বাস্তবিকই খারাপ করছিল। সম্ভবতঃ অতিরিক্ত ভোজনের ফলে, কিংবা গত রাত্রির অনিদ্রা ও নানা বিপৎপাতের ফলে, কেন যে ঠিক বলতে পারি না। তবে পা দুটো যেন আর সোজা হয়ে মাটীতে পড়ে না। ঘুমে সারা দেহ টল্‌ছিল।

টল্‌তে টল্‌তেই হল-ঘরের দিকে আস্‌তে যাচ্ছি, মোহনবাবু বলে উঠলো—শুয়ে পড়ো সুপ্রিয়া! তোমার পা টল্‌চে যে!

বললাম—ভয়ঙ্কর পিপাসা পেয়েচে, জল খেয়ে আসি।

মোহনবাবু তাড়াতাড়ি উঠে এসে, আমার হাত ধরে বললে—একটা চাকর একটা বামুন—অভাব কোথায় দেখলে যে, জল খাবার জন্যে এই অবস্থায় বাইরে যাচ্ছো? তুমি শুয়ে পড়ো গে, আমি চাকরকে দিয়ে এক্ষুণি জল পাঠিয়ে দিচ্ছি।…খুব সাবধানে থেক'।…আমি নীচের বৈঠকখানায় থাক্‌লাম্‌।…চাকরটা তোমার ঘরের বারান্দায় থাক্‌বে। দরকার হলে ডেকো।

মোহনবাবু চলে গেল।

…বাস্তবিক বিছানায় পড়ে আমার দেহটা যেন জুড়িয়ে এল।… চোখ আর মেল্‌তে ইচ্ছা হয় না।

চাকরে একটা ভারী গ্লাসে করে এক গ্লাস জল দিয়ে গেল। সমস্তটাই এক নিশ্বাসে খেয়ে ফেল্‌লাম।

গ্লাসটা নামিয়ে রেখে চোখ বুজে ঢুল্‌তে ঢুল্‌তেই কোন রকমে

গায়ের ব্লাউজ্‌টা খুলে ফেল্‌লাম।—কাপড় চোপড় সাম্‌লে নেওয়ারও শক্তি রইলো না। চাকরকে হুকুম দিলাম—আলো নিভিয়ে দিস্‌।

তারপর—আর চোখ চাই নি। বেদম্‌ ঘুমিয়েচি!

...তখন কত রাত্রি জানি না। নিস্তব্ধ নিঝুম রজনীর কোন্‌ অশুভ অথবা শুভ মূহুর্ত্তে আমার ঘুম ভেঙে গেল!—ভাঙলো সহজে নয়,—ভাঙিয়ে দিলে!

উঃ বুকখানায় কে যেন একটা প্রকাণ্ড ভারি জগদ্দল পাথর চাপিয়ে রেখেচে!...এতটুকু শক্তি নেই যে নড়ি,—পাথরটাকে সরিয়ে দি!...কিন্তু বিশ্রী এক দুর্গন্ধ পেলাম!

—সর্ব্বনাশ!...ভগবান ভগবান!—এ আবার কি করলে তুমি?... 'মঙ্গলময়' নাম ধরেচ—সে কি সকলের কাছে নয়?—দুর্দ্দশার সর্ব্ব নিম্ন সীমান্তে এমনি করে ছুঁড়ে দেওয়াই যদি তোমার উদ্দেশ্য ছিল,—তবে অন্য পন্থা ধরলে না কেন? মেয়ে মানুষের পক্ষে এতবড় নির্ম্মম অপমান কোন্‌ আইন্‌ দেখে বের করলে আজ?

—কে একটা আমার বুকের ওপর শুয়ে রয়েচে!...ভূতুড়ে বাড়ী বলে নানা আশঙ্কা হয়েছিল—এখন তার নাম গন্ধও স্মরণে এলো না,—নিশ্চয় বুঝে নিলাম—সেই চাকর ব্যাটা! জল খাওয়ার পর আলো নিভিয়ে দিতে বলেছি, কিন্তু উঠে গিয়ে দরজায় খিল এঁাট্‌তে শক্তি পাই নি!...ছি ছি—ওরে ও হতভাগিনী—আজ কী ঘুম তোর পেয়েছিল?

চীৎকার করে উঠলাম—মোহনবাবু! মোহনবাবু!

বিপদের ওপর বিপদ!—পরণের কাপড়খানায় টান পড়লো,—

হতভাগা বোধ হয় আমার মুখে চাপা দিবার জন্যে টানতে সুরু করেছিল।

দেহে যত শক্তি ছিল, তত শক্তি দিয়েই দুর্ব্বল চাকরটার গলায় এমন কামড়ে ধরলাম যে, সে যাতনা সইতে না পেরে, আমাকে ছেড়ে দিলে।

মুক্তি পেয়েই মনে হল—আজ এমনি করে নিজের টুটিটা যদি নিজেই কামড়ে ধরতে পারতাম!

বুকখানা বেজায় ধড়ফড় করছিল।

আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে ঘরের মেঝেয় দাঁড়ালাম। তার পর সেখানে দাঁড়িয়ে ডাক দিলাম—মোহনবাবু! মোহনবাবু!

বাড়ীতে অন্য দিন শুনেছি—জন-মানবের বসতি থাকে না, কিন্তু আজ তো আমার দু'-দুটো চোখ দিয়ে,বেশ ভাল করেই প্রত্যক্ষ করেছি—বাড়ীর সব ঘরেই লোকজন রয়েচে। চার চারটী বড় লোকের মেয়ে, তারাও কি বিপদের সময় সাড়া দেওয়াকে ছোটলোকী কায়দা মনে করে!—আর মোহনবাবু—সে-ও কি মহাঘুমে ঘুমিয়ে গেল!

ইলেক্‌ট্রিক আলোর সুইচ্‌টা যে কোথায় তা-ও খুঁজে খুঁজে পাচ্ছি না…অন্ধকার!

হল-ঘরে ঢুকলাম।

পরণের কাপড়খানা গুছিয়ে প'রে, বাইরে এসে দেখি—একটা ছুঁচ পড়লেও তার শব্দ পাওয়া যায়—এমনি নিস্তব্ধ!…অথচ আমাকে বিপর্য্যস্ত করতে খানিক আগে কী এক তাণ্ডব লীলার অভিনয় হয়ে গেছে!

নীচে এসে, থম্‌কে দাঁড়ালাম!

মোহনবাবু বলেছিল—বৈঠকখানায় থাকবে। কিন্তু কোথায় বৈঠকখানা!—কালকের সেই ভোর বেলায় সরাসরি উপরের ঘরে গেছি, তার পর একটিবার নাইতে আসা ছাড়া নীচের সঙ্গে আমার মোটেই পরিচয় নেই।

দেখ্‌লাম—সদর দরজার লাগা ঘরখানিতে আলো জ্বলচে।

দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম—মোহনবাবু!

এক ডাকেই সাড়া পেলাম—কে?

বললাম—আমি সুপ্রিয়া।

ব্যস্ত হয়ে মোহনবাবু বললে—ব্যাপার কি সুপি? হঠাৎ উঠে এলে যে? ঘুম হচ্ছে না? তারপর 'মা গো!' বলে একরকম যন্ত্রণার শব্দ করে, বললে—ভেতরে এসো, দরজা ভেজানো রয়েচে।...আমারও শরীরটা আজ বেজায় খারাপ হয়ে পড়েছে।

ঘরে ঢুকে দেখি—সর্ব্বাঙ্গে চাদর মুড়ি দিয়ে মোহনবাবু শুয়ে আছে। মাথার চুল উস্কো খুস্কো। বললে—ঘণ্টা খানেক আগে, হঠাৎ খুব শীত করতেই চাদরখানা মুড়ি দিয়ে চুপচাপ পড়ে রয়েছি। সম্ভবতঃ জ্বর টর কিছু হবে। কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? একখানা চেয়ার নিয়ে ব'সো।...নতুন জায়গায় ঘুম হচ্ছে না—না?...আমারও অবস্থা কতকটা সেই রকমই।

খুব গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—খানিক আগে, আপনি আমার ডাকাডাকি শুন্‌তে পান নি?

—তুমি আমায় ডেকেছিলে? কিন্তু শুনি নি তো। শুন্‌তে পাওয়া—

হ্যাঁ—যাবে না বটে! তোমার ঘরখানা, এ ঘরখানার পাশাপাশি তিন খানা ঘরের পরে যে ঘর তারই ওপর। কাজেই অত দূরের ডাক… …ঘরের ভেতর থেকে ডেকে ছিলে?

—হ্যাঁ। বাইরে দাঁড়িয়েও দু-তিন ডাক দিয়েছি। বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। মুখ ফিরিয়ে, অপমানের তীব্র জ্বালা-জনিত ব্যথাকে সহিষ্ণুতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

মোহনবাবু জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েচে সুপ্রিয়া? অমন ধারা মুখ করলে যে?

আমি আর সহিষ্ণুতাকে চেপে রাখতে পারলাম না। রোষদীপ্ত স্বরে বললাম—কেষ্টাকে চাকর সাজিয়ে পাঠালেন—সর্ব্বনাশের শেষ সীমা দেখিয়ে সে সরে পড়লো! তারপর আজকের এই চাকর…কোথায় সে? আমি তাকে এক্ষুণি চাই মোহনবাবু!—এক্ষুনি চাই।

ভ্যাবাচ্যাকার মত তাকাতে তাকাতে মোহনবাবু বললে—ব্যাপারটাই যে ভাল করে জানতে দিলে না সুপ্রিয়া!—কি হয়েচে?

—সে আমার অপমান করেছে। আপনার বিশ্বাসী আর অতি বুদ্ধিমন্ত চাকর—আমার ঘুমন্ত অবস্থায়, চোরের মত ঘরে ঢুকেছিল—

—"বল কি?"—মোহনবাবু ঘা-খাওয়া সিংহের মত উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো! গায়ের চাদরখানা এঁটে জড়িয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে একটা ছোট খাটো কথাও না কয়ে সোজা উপরে উঠে গেল।…আমি তখন মনে ভাবচি—ছোট লোক শূয়ারটার জন্য কি শাস্তির ব্যবস্থা করি!

কিন্তু অপরাধী যেমন লুকিয়ে অপরাধ করেছিল—পালিয়েছেও তেমনি লুকিয়ে!

মোহনবাবু ফিরে এসে বললে—শূয়ার পালিয়েছে! কিন্তু পালিয়েই কি রেহাই পাবে? আমি তাকে যেখান থেকে পারি ধরে আনবো। যদি শাস্তি না দিলে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হয় সুপ্রিয়া! তাহলে ঘাড় পেতে দিচ্ছি, অথবা বুক এগিয়ে দিচ্ছি,—ছুরা-পিস্তলের আবশ্যক হয় তো—তা-ও জুগিয়ে দিচ্ছি—সাধ মিটিয়ে নাও!

অনুতাপ যে আমার কি জন্য মনে এলো,—তারও কারণ খুঁজে পেলাম না। বললাম—আপনাকে শাস্তি দেব?—একথা বলে আপনিও তো আমার জন্যে বিশেষ কম শাস্তির আয়োজন করলেন না মোহনবাবু!...রাগের যে কত বেশী কারণ—সে কি আপনি মানুষ হয়েও বুঝচেন না? দুপুর রাত্রিতে—চোরের মত—একজন মহিলার—

মোহনবাবু কথার মাঝখানেই বলে উঠলো—বিশেষতঃ বাড়ীর চাকর হয়ে...

আমি রেগে বললাম—এখানে চাকর-মনিবের তুলনা দেবেন না, তাতে উল্টে আমারই অপমান বেশী হবে। যদি স্বয়ং তার মনিব হত, তবু অপরাধ সমান!...কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার—

—দুর্ভাগ্য আমারও নেহাৎ কম নয় সুপ্রিয়া!...নইলে এমন চাকরকেও বিশ্বস্ততার সার্টিফিকেট দিই!...কেষ্টা কান ম'লে জাগিয়ে দিয়ে গেল, তবু আমার ঘোর কাটলো না!...তারপর সহসা আমার হাত ধরে বলে উঠলো—আমাকে সাজা দাও সুপ্রিয়া!—আমি দণ্ড নিতে দু'লক্ষবার রাজী রইলাম। বলতে বলতে একখানা চেয়ারে বসে

পড়তেই তার চাদর খানার ফাঁক দিয়ে আমার গায়ের ব্লাউজ্‌টা বেরিয়ে পড়লো।

রঙ দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—ওটা কোত্থেকে আনলেন?—আমার ব্লাউজ্‌!

মোহনবাবু চমকে উঠেই, হেসে ফেললে—অ্যাঁ! তোমার ব্লাউজ্‌?···আমি ভেবেছিলাম—সেই শূয়ারটার গেঞ্জি!...বারান্দায় পড়ে ছিল।···

এ-ও এক কেলেঙ্কারী!···শূয়ারটার গেঞ্জি!

আমি গম্ভীর হ'য়ে বললাম—আপনার কি খুব বেশী অসুখ করছে?...

মোহনবাবু বললে—কম ও নয় সুপ্রিয়া!···কিন্তু সেজন্যে তুমি বিচলিত হয়ো না। ঘণ্টা খানেক বাদেই আমি রামবাবুর খবর নিয়ে আসচি।...কিন্তু আর এক কথা,—উড়ে বামুনটাকে তোমার বিশ্বাস হয় তো সুপ্রিয়া?···যদি না হয়, তা হলে এক্ষুণি দোসরা বামুন নিয়ে আসতে হবে।

এত বিপদের বেড়াজাল-বেষ্টিত হয়েও, আমার হাসি এল। বললাম—বিশ্বাসী চাকরের কি একটা হাট আছে মোহনবাবু?—চাল-ডাল-হাঁড়ী-কলসীর মত কিনলেই পাওয়া যায়?···

মোহনবাবু মাথা-গায়ের চাদরটা বেশ ভাল রকম জড়িয়ে, মুড়ি শুড়ি দিয়ে বিছানায় পড়লো। তারপর কাতরানির শব্দ করতে করতে বললে—কাল থেকে রয়েচ, তুমি বুদ্ধিমতী, বেশী করে আর কি বোঝাব, যা ভাল বোঝ ক'রো।

আমি বললাম—আর কোনো লোককে বিশ্বাস করতে আমি রাজী নই মোহনবাবু!...কপাল মন্দ, তাই মেয়েমানুষের সব চেয়ে যা বড় অপমান, আজ তা-ও মুখ বুজে স'য়ে থাকতে হ'ল।...কিন্তু কি বলছিলেন—ঘণ্টা খানেক বাদেই বাবার খোঁজ নিতে হাঁসপাতালে যাবেন?

—হ্যাঁ, না গেলে আর উপায় কি?...দুর্ভাবনায় ভেবে মরার চেয়ে দুঘণ্টা কষ্ট সহ্য করা বুদ্ধিমানের কাজ সুপ্রিয়া! কিন্তু তুমি আর দেরী করছো কেন?...হাত মুখ ধুয়ে ফেল গে!

বললাম—যাচ্ছি। কিন্তু আপনার ঐ উড়ে ফুড়েকে আমি বিদেয় করে দেবো। রান্না, ভা-রি ত আমার কাজ, আমি আপন হাতে রেঁধে ফেলবো। দু চার জন অতিথি থাকে, তাতেও আপত্তি নেই। ...তবে হাট বাজারে কে যাবে সেই এক সমস্যা।...আচ্ছা এ পাড়ায় ঠিকে ঝি মেলে না?

মোহনবাবু জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে বললে—যা হয় করো সুপি! আমার ভাববার শক্তি নেই। কিন্তু চাকরকে বিশ্বাস হ'ল না—আর ঝি মাগীকে—

তাড়াতাড়ি বললাম—সে যে নারী!...চুরী করুক, খুন করুক, সহ্য হবে। কিন্তু পুরুষের ঘৃণিত ব্যবহার...চিন্তা করাও মহাপাপ!

মোহনবাবু—আঃ উঃ ইত্যাদি নানারকম শব্দ করতে করতে সম্ভবতঃ ঘুমিয়ে পড়লো। আমি তাড়াতাড়ি কল-তলায় চলে গেলাম। তখন দ্বিতলের একখানা ঘরে, অতিথি ক'জনের মধ্যে যে কোন একজন হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান ধরেছিলেন।

স্নানান্তে ঘরে ফিরে আসতে আমার পা কাঁপছিল। অন্তরটা আশঙ্কার পরিবর্তে অবজ্ঞার ভারে নুয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ যে পরের বাড়ী,পরের ঘর ! আপন ঘর হারিয়ে,আপন জনকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়ে, আমার যে এই পরগৃহবাসী—পরপদলেহী—পরনির্ভরশীল হওয়াই ললাট-লিখন ! এ ঘরে যদি আজ আমারই চোখের সামনে কোন এক দৈত্য এসে, এই ভাঙা বুকের কলজে খানাই দুহাতে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে, ঘরের মেজেয় ছড়িয়ে রাখে, তবু বেঁচে থাক্‌তে হলে এই ঘরই আমাকে বরণ করে নিতে হবে। এ আমার বন্দীত্ব, সাধ করে বরণ করা, না দৈবাধীনে—তা ভেবেও কূল-কিনারা পাই না।

আমার কাপড় ছাড়া হ'য়ে গেছে। বাইরের বারান্দায় আস্‌বার জন্য মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো। আজ বাইরের মুক্ততার অভাবে প্রাণ হাঁপিয়ে পড়েছে।...দু পা এগিয়ে আস্‌তেই দেখি—পালঙ্কের নীচে একটা গেঞ্জি !—হাতে তুলে দেখি—এ তো চাকরের নয় !—এ যে মোহনবাবুর !...বেশ মনে আছে—কাল বিকেলে তার গায়ে দেখেছিলাম।...মাথাটা ব্যাথায় আর দুর্ভাবনায় টন্‌ টন্‌ করে উঠলো ! ...কিন্তু এমনি আমার পোড়া অদৃষ্ট ! কত ভাগ্যবতী সতী-সাবিত্রীর মাথার অসুখ থাকে,—হিষ্টিরিয়া থাকে,—মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।···কিন্তু হা-রে—আমার তুষানল-দগ্ধ-বরাত !—তোর কি অটুট স্বাস্থ্যলাভই জীবনের চরম অভিশাপ !

রাগ হল।—এত রাগ যে, ষ্টীমের জল বেশী হয়ে পড়লে ইঞ্জিনখানা যেমন থর্‌ থর্‌ করে কাঁপে, আমিও তেমনি কাঁপতে লাগ্‌লাম।

তখনি নীচে নেমে এলাম...হাতে গেঞ্জিটা। মোহনবাবুকে দেখাবো, তাকে জিজ্ঞাসা করবো—মুখের অমৃত অন্তরের গরলরাশিকে কত-ক্ষণ গোপন করে রাখতে পারে ?

কিন্তু প্রায় পদে পদে বাধা পাওয়াই আমার ভাগ্যলিপি !

মোহনবাবু নেই !...রাগ যেন গলে গলে জল হয়ে গেল !...সর্ব্বনাশ করাই যার মূলমন্ত্র, শুভার্থীর আসন দখল করবে সে কোন্ ইচ্ছা শক্তিতে !···মোহনবাবু আমার হিতৈষী, তার দ্বারা অমঙ্গললাভ কখনো সম্ভবপর নয়। অনর্থক সন্দেহ করার জন্য পাপ মনকে প্রায়শ্চিত্ত করার ভয় দেখালাম। মোহনবাবু এলে, নিজের মুখে সকল কথা খুলে বলতে হবে। যদি বিচারে দণ্ড পাওনা হয়, তো তাই আমার আসল প্রাপ্য !...নিশ্চয়ই বুঝলাম—বাবার সংবাদ আন্‌তে, বেচারী জর গায়ে বেরিয়ে গেছে।...ছি ছি—নীচ মন আমার !—এই সদাশিব পরমোপকারী বন্ধুকে সন্দেহের হীন চিন্তাশক্তি দিয়ে অপমান করছিলাম !

ওপরে না উঠে, রান্নাবাড়ীর দিকে এসে পড়লাম।

উড়ে বামুনকে জবাব দিতে চেয়েছি, কিন্তু দিব্যি আরামে তার ডালতরকারী নেমে গেছে, প্রকাণ্ড এক পিতলের হাঁড়িতে ভাত ফুট্‌চে।

উড়ে বামুন সম্ভ্রম দৃষ্টিতে চেয়ে, তাড়াতাড়ি তার বসবার টুল-খানা বাড়িয়ে দিলে। আমি কিন্তু সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাক্‌লাম না। এইবার যা থাকে কপালে,...তেতলার সেই সম্ভ্রান্ত অতিথিদের

সঙ্গে আলাপ করবার লোভ সম্বরণ করা আমার পক্ষে কঠিন হ'য়ে পড়েছিল।...

চারজনকার চারখানা ঘর নির্দ্দিষ্ট বটে, কিন্তু দেখলাম—একখানা ঘরে চারটিতে একটি হ'য়ে তাস খেল্‌চে! আমাকে দেখে, সকলেই খুসী হ'য়ে উঠলো। মুহুর্ত্তের জন্য তাদের চল্‌তি খেলা বন্ধ হয়ে গেল। একজন বললে—এসো ভাই ডুমুরের ফুল!...

লজ্জা হল। মুখখানা আপনা হতে নুয়ে পড়লো।—সে কিন্তু ঠাট্টার জের টান্‌তে লাগলো—তারপরে...সখী ডুমুর-ফুল!...ছেড়ে আস্‌তে পার্‌লে?...বোধ হয়, নতুন নতুন—না?

আমি ঈষৎ বিরক্ত হয়ে, অথচ আরক্তিম মুখে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি বল্‌লেন বুঝ্‌তে পারি নি।...

উত্তর পেলাম—বোঝাবুঝির কি শক্তি আছে?—সে সব ঘুমিয়ে পড়েছে।...আমরাও যে তাই!...সাপে না কামড়ালে লোক সাপের বিষের যাতনা বোঝে না।...কিন্তু যদি নড়তে চড়তে ভুলে না গিয়ে থাক, তা হলে অজ্ঞান হওয়ার আগে,—যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান থাক্‌বে,—ততক্ষণ যতটুকু সম্ভব হয়, ততটুকুই বাধা দিয়ো। পায়ের চাপ পেয়ে মরবার সময় ক্ষুদে পিঁপড়েটাও কামড় না দিয়ে অম্‌নি অম্‌নি মরে না। ...তারপরই হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—বিয়ে থা করবো বলেছে না কি?...

আর একজন বললে—তা না বল্‌লে—কি মুখের কথায় সর্ব্বাঙ্গ জালের মধ্যে এলিয়ে দিয়েছে না কি?...মুখখানা তো শিশির-ধোয়া-পদ্ম!...

আমি চেষ্টা করেও মুখে হাসি আন্‌তে পারলাম না। বললাম—আপনারা কাল যখন এলেন, আমি জেগে ছিলাম। সকাল বেলায় মোহনবাবুকে...ও—হ্যাঁ,—বোধ হয় মোহনবাবুর সম্বন্ধে আপনারা আমায় ঠাট্টা করলেন? কিন্তু ওসব কিছু নয়। ভুল বুঝ্‌বেন না। তিনি আমার পিতৃবন্ধু...দাদার মত ভালবাসেন—স্নেহ করেন। তা ছাড়া—

—"সুপ্রিয়া!"

—"ঐ মোহনবাবু এসেচেন!...কিছু মনে করবেন না, আমি এক্ষুনি আসচি। আমার বাবা হাঁসপাতালে আছেন, কেমন আছেন শুনে আসি,—বলেই আমি আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করলাম না।

তাড়াতাড়ি নাম্‌তে, সিঁড়ির ধাপে পায়ের বুড়ো আঙুল ফেটে রক্ত পড়লো, তবু দাঁড়াই নি।

মোহনবাবু সকালকার সেই চাদরখানা গায়ে দিয়ে, বসে বসে হাঁপাচ্ছিল।

আমি সাহস করে—বাবার কুশল সংবাদ চাইতে পারলাম না...আহা বেচারী!—ওর নিজেরও অসুখ যে!

না জিজ্ঞাসা করলেও মোহনবাবু আপনা থেকে বললে—খবর ভাল সুপ্রিয়া! এত ভাল আমি আশা করতে পারি নি।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হল?

—হ্যাঁ,...গিয়েই দেখি,—বিছানায় বসে বসে দুধ খাচ্ছেন। অনেক কথাই হল। তারপর গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললে—একটুখানি

জল দেবে সুপ্রিয়া? পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। বুকখানার ধড়ফড়ানি ভয়ঙ্কর বেড়ে গেছে,—কথা কইতে পারছি নি।

তাড়াতাড়ি জল দিতে যাবো,—কাল রাতের বেলায় যে গ্লাসটা ছুঁড়ে হতভাগা পিশাচ চাকরটাকে মেরেছিলাম—সেই গ্লাসটাই সর্ব্বপ্রথম নজরে পড়লো। কিন্তু অন্তরের কী দুর্ব্বলতা!—পিপাসার্ত্ত, আতুরকে জল দিবার জন্য আজ সেই দূষিত-গ্লাসটাকে আমি হাতে তুলে নিতে পারলাম না। সুমুখের আল্‌মারী খুলে,—একটা কাচের গ্লাস বের করে, জল দিলাম।

সম্ভবতঃ মোহনবাবু আমার এই দারুণ দুর্ব্বলতা বুঝ্‌তে পেরেছিল। কিন্তু কারণ জিজ্ঞাসা করে নি।

জল পান করে কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে, সে বল্‌তে লাগ্‌লো—রামবাবু বলেছেন—'সুপিকে একটিবার নিয়ে এসো মোহন! আমি দেখ্‌বো।'

তাড়াতাড়ি বললাম—কিন্তু আপনার যে বড্ড অসুখ মোহনবাবু! কার সঙ্গে যাবো?...কিন্তু যদি অনুমতি দেন,—তাহ'লে একখানা গাড়ী ভাড়া করে আমি একাই—

—যেতে হবে না সুপ্রিয়া!...ডাক্তারবাবুরা ওবেলাতেই তাঁকে ছেড়ে দেবেন। বিকেলবেলা ছ'টার সময় আমি তাঁকে এখানেই নিয়ে আসবো। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

আঃ—ভগবান! দুঃখিনীর প্রতি তোমার এত দয়া! সহানুভূতির প্রাবল্যে অন্তর আমার ছেয়ে উঠলো। বললাম—আপনি কেন নিজের দেহটা একবার ডাক্তার বাবুকে দেখালেন না। যদি কোন ওষুধপত্র খেলে,—

মোহনবাবু—ম্লান হাসি হেসে বললে—সাংঘাতিক বিপদ যখন মাথায় চাপে, তখন তুচ্ছ বিপদকে গ্রাহ্য করলে চলে না সুপ্রিয়া! আমার এ সামান্য অসুখ,…কিন্তু উড়েটাকে তাড়িয়েছ না কি? …খাবে কি?

আমি হাস্‌তে লাগলাম। এতক্ষণে সত্যি সত্যিই আমার আসল হাসি পেয়েছিল। বললাম—জ্বরে ভুগবেন, তবু খাই-খাই কেন?… আজ আর কিছু খাওয়া চলবে না।

পালঙ্কটার ওপর শুয়ে পড়ে, মোহনবাবু বললে—আমার জন্য আমি একফোঁটাও চিন্তা করি নি সুপি! কিন্তু এই অবস্থায় যদি তোমার কোন কষ্ট হয়, তাহলে জীবন ভর সে কষ্ট আমার সাথের সাথী হয়ে থাকবে।…আর কথা কাটাকাটি করো না, যাও—খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করগে।…বলতে বলতে যাতনার সঙ্গে পাশ ফিরে শুলো।…

কি যে করি—আমার আর মাথায় যোগায় না, কিন্তু বলিহারী শক্তি এই ভদ্রলোকের! যতবার বিপক্ষে কোমর বেঁধে দাঁড়াতে চাই—ততবারই কোত্থেকে দু শো সহানুভূতির স্রোত কল্ কল্ শব্দে ছুটে আসে—আমার এই শুকনো অন্তর-মরুভুর মাঝখান দিয়ে!

অতিথি ধনী কন্যাদের কি অবস্থা হবে—সে আমার ভাববার প্রয়োজন নেই। আমি-ই তো এক অতিথির অতিথি, অন্য অতিথির সঙ্গে কি আমার সম্বন্ধ! কাজেই রান্না খাওয়ার বালাই পোয়াতে আর চেষ্টা করলাম না। অথচ মোহনবাবুকে যদি বলি যে, না-খেয়েই আমার দিন যাবে—তাহলে তো রক্ষা থাকবে না! অসুস্থ শরীরে

বেচারা হয়তো নিজেই বামুন ডাক্‌তে বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু পোড়া পেটের জন্য আজ কিছুতেই আমি এতটুকু চেষ্টা করবো না—এ আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

বারকতক বাইরে বাইরে ঘোরাঘুরি করলাম। বারকতক নীচে নামলাম, তারপর এক সময় মোহনবাবুর মাথার কাছটিতে বসে, তার গায়ে-মাথায় হাত বুলোতে সুরু করলাম।

ঠিক তখন দুপুর বেলা। ক'লকাতা সহরের কোথায় কি হচ্ছে কে বলতে পারে! আমাদের এই পচা থস্‌থসে গলিটা যেন ঝিমিয়ে রয়েচে! ওপরে, অতিথিদের ঘরেও কোন সাড়া শব্দ নাই। আমি ঠাই—বসে রয়েচ—অর্দ্ধ সংজ্ঞালুপ্ত এক রোগীর জ্বর-তপ্ত ললাটে হস্ত নিবদ্ধ করে!

ওমা!—এ আবার কি! এ যে মোহনবাবুর পূর্ণ বিকারের লক্ষণ দেখচি!…কি হবে! কি হবে!…

ওমা!—উঠে বসে যে!…

উঃ! চোখ যেন রাঙা জবার মত টক্‌টকে! মাথাটার আধখানায় ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা!…কি সর্ব্বনাশ! আমি সহায়হীনা একা—এই ভরা দুপুরে বিকারী রোগী নিয়ে কেমন করে চারদিক বজায় রাখবো!

ডাক্‌লাম—মোহনবাবু!

মোহনবাবু—বার দুই দাঁত কড়মড় করে, বিকট এক হাসি হাস্‌লে!

আমার গা-টা ভয়ে শিউরে উঠ্‌লো!

কিন্তু হাসির পর সে কী—আর্ত্তনাদ! ভেউ ভেউ কান্না!... ভয়ানক মুস্কিলে ফেল্‌লে তো!

দু হাত দিয়ে—দুই কাঁধ জোরে চেপে ধরে, বললাম—অমন করছেন কেন?—আমি যে বড্ড ভয় পাচ্ছি! আপনার পায়ে পড়ি ভাল হয়ে—

—আবার হাসি!...

আজ আমার মনে হচ্ছে—লক্ষ বজ্র-হুঙ্কারের নিদারুণ শব্দ যেন এই মোহনবাবুর তাণ্ডব হাসির শব্দে বাঁধা পড়ে গেছে! বাপ্ রে বাপ! জীবনে কখনো বিকারী রোগীর উন্মত্ততা দেখ্‌বার দুর্ভাগ্য আসে নি,—সে কি এত ভয়াবহ!

কিন্তু এই চিন্তা-ভয়ের ভীষণ আক্রমণ থেকেও আমাকে মোহন-বাবু আজ এমন করে রেহাই দিয়ে দিলে—যার স্মৃতির ব্যথায় আজো আমি রাতদুপুরে চম্‌কে উঠি!

হঠাৎ দুহাত দিয়ে সাপ্‌টে আমার গলাটা ধরে, এমন এক ঝাঁকানী দিয়ে আমাকে তার কুক্ষিগত করে ফেল্‌লে যে, আমি তো আমি, আমার সাতপুরুষের এমন কারো তেমন শক্তি ছিল না, যার জোরে এই পিশাচ কু-মতলবী বিকারীকে তার দুষ্ট অভিসন্ধির জন্য সাজা দেয় বা বাধা দেয়!

নিশ্বাস প্রশ্বাস চলছে—ভয়ে কাঠ হয়ে রয়েছি,—বেঁচে আছি—তবু যেন মনে হচ্ছে—হয়তো মরে গেছি, হয়তো এ আমার পরলো-কের নরক-যন্ত্রণা!...কিন্তু মরতে পারলেই আজ বাঁচতাম!

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র যে, সে-ও তার তুচ্ছ বিপদের কালে মুখ

বুজে থাকে না। আমিই বা থাকবো কেন ?—হোক্ রোগী, হোক্ বিকারের ঘোরে সংজ্ঞাহারা ; তবু ছাড়বো না,—আমি তাকে যেমন করে হোক্ প্রতিশোধের জ্বালা জানিয়ে দেব।

চাপে আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তবু সেই অবস্থায় থেকেই, মোহনবাবুর গলার মাঝখানে খুব জোরে এক কামড় বসিয়ে দিলাম, আর ডান হাতের পাঁচটা আঙুল দিয়ে তার বাঁ চোখটা যথাসাধ্য জোরে খামচে ধরলাম। বাছাধনের বিকার ফিকার তখন মগজ ছেড়ে উধাও হয়ে গেছে!—যন্ত্রণায় বিকট চীৎকার করে উঠতেই, আমি মুক্ত হয়ে গেলাম।

তারপর প্রতিজ্ঞা করলাম—যদি আমার লজ্জা বলে কোন কিছু মনের মধ্যে থাকে, তো কস্মিন্‌কালেও মোহনবাবুর ঐ ঘরমুখো হবো না। রোগের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে ওর 'খাবি' খাওয়ার সময় এলেও না।...বেলতলায় যাওয়ার সুখ তো একবার নয়—বহুবার টের পেয়েছি! আর কেন ?...

সোজা ত্রিতলে উঠে পড়লাম।

মেয়েরা তখন ঘরে ঘরে খিল্ লাগিয়ে ঘুমুচ্ছে। পোড়াকপালী আমি, তাই ঘুম তো অতি দূরের কথা, পেটে অন্ন পর্য্যন্ত পড়লো না আজ!

কাকেই বা ডাকি!—কে-ই বা আমার প্রাণের ব্যথা বোঝে! চোখ দুটো আজ দুদিন থেকে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছ্‌লো!—সহসা কোত্থেকে যে তাতে প্রবল জোরে বান ডেকে গেল!...গণ্ড বেয়ে প্রবাহ ছুটেচে—বুক ভেসে যাচ্ছে!

ওরে পোড়াকপালী—বাঙালীর ঘরের মেয়ে! তোর চোখের ধারা কি আর শুকোবার? ও যে শ্রাবণের ধারাকেও হারিয়ে দিতে পারে!—ও যে ঘন বাদল-বরিষণের ধারা!...

খোলা ছাদে বসে পড়লাম।

রদ্দুরে কাঠ ফাটচে, তবু আমার আশ্রয় নাই! এখন যেখানে বসে রয়েছি, একটা নিকৃষ্ট কুকুর বিড়ালেও সে ঠাঁই এম্নি সময় পছন্দ করতো না,...হায় হায়—তবু সে আমার আশ্রয় নয়, বারুদের স্তূপ! ফাঁসী ঝুলবার কাষ্ঠাসন!...

পড়ন্ত বেলায় একখানা ঘর থেকে একটি মেয়ে বাইরে বেরুলো। তারপর আর একটি। বাকী দুটির ঘর তখনো বন্ধ।

একজন জিজ্ঞাসা করলে—এ কি তোমার বাবুর হুকুম নিয়ে এসেচ বাছা? ভরা দুপুরে ঘরের কাছে চৌকি দিচ্ছ যে?

আমি আর বল্‌বো কি? বল্‌বার মুখ যে আপন হাতে নুড়ো দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছি!

কিন্তু কি বিশ্রী কথা বলার ভঙ্গি! আর কত কদর্য্য তাদের ভাষা!

একজন বল্‌লে—কচি খুকী, না?—কিচ্ছুটি বোঝ না? বাবু পাঠালেই অম্‌নি আস্‌তে হবে বুঝি?...কি জন্যে বসে রয়েচিস্‌ বল্‌? নইলে মুখে হাতা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দেব। 'বাবু করা' বের করে দেব। ...ভা-রি তো আমার রূপ, রূপে গগন ফাটে!

ভয়ে ভয়ে বললাম—আপনাদের কথা বুঝি, সে শক্তি আমার

নেই। আজ কেমন করে যে বোঝাব—আমার মন্দ উদ্দেশ্য এতটুকু ছিল না...

ঝঙ্কার দিয়ে রমণী বল্‌লে—ওরে আমার নবদ্বীপের বিষ্ণুপ্রিয়ারে! গুণের আর শেষ-সীমা নেই।...কিচ্ছু জানো না? দোর-গোড়ায় বসে ছিলি কেন্ লা ছুঁড়ী?...তোর কোন্‌পাড়ার বাবু আছে—আমাদের ঘরে? অ্যাঁ?

যে দুখানা ঘর বন্ধ ছিল, সে দুখানা প্রায় একসঙ্গেই খুলে গেল। কিন্তু চোখ দুটো কি আমার ভুল দেখলে!...এ ব্যাপার তো হবার নয়, অথচ স্বচক্ষে দেখে—দেখি নি বলি কি করে?

দেখলাম—শেষের ঘরখানা থেকে, ৪নং স্ত্রীলোকটির পেছনে পেছনে একটি বাবুও চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বেরিয়ে এলেন।

হ্যাঁ,ধাঁধাঁ বটে বাবা!—গোলকধাঁধাঁর ঠাকুরদাদা!

এই সম্ভ্রান্ত অতিথি ক'জনের সঙ্গে পুরুষ মানুষ আসার সংবাদ আমি এর পূর্ব্বে একবারও পাই নি। এই সর্ব্বপ্রথম চাক্ষুষ করলাম।

পুরুষটি আমায় দেখে, মিটি মিটি চাইতে চাইতে এগিয়ে আসছিলেন। কিন্তু তাঁর 'জোড়া' স্ত্রীলোকটি বাধা দিয়ে বললে—বড্ড মনে ধরেচে বটে? চেহারাখানা মিঠে, চাউনিটাও জুতসই... পেলে মন্দ হয় না—কি বল?

আমি আর সেখানে তিষ্ঠুতে পারলাম না। অশক্ত চরণে সিঁড়ি ভেঙে দ্বিতলে চলে এলাম।

কথায় আছে—যে মাটীতে পড়ে লোক—ওঠে তাই ধরে।...

মোহনবাবুই সর্ব্বনাশের মধ্যে এনে ফেলেচে, আবার তার আশ্রয় ছাড়া উদ্ধারের দ্বিতীয় পন্থাও আমার চোখে পড়লো না।...

কিন্তু সত্য সত্যই যে আশ্রয়হারা আমি !—

কই কোথায় মোহনবাবু! ঘর খালি,—শূন্য তার রুগ্নশয্যা... খাঁ খাঁ করছে! এতবড় বাড়ীতে এমন কেউ নেই, যে বলে দেয়—কোথায় মোহনবাবু, কোন্ কাজের তাড়ায় সে নিযুক্ত!

যখনই ভয় পেলাম—সেই মুহূর্ত্তেই স্বস্তির শীতলতায় আমার বুকখানা যেন জুড়িয়ে গেল!...কাটা ঘায়ের জ্বালা সইতে পারি, স'য়েও চলেছি, কিন্তু নতুন আক্রমণকে আর বরদাস্ত করবার সামর্থ্য নেই আমার। সে কি রক্তমাংসের দেহে কেউ পেরেছে কোন দিন? যাক্ ভালই হয়েচে,—মোহনবাবু নাই বা থাক্‌লো। ভগবান দয়াময়. তাই দয়া করে সে ভণ্ড হতভাগাকে আমার পরিত্রানের পথে কাঁটা করে খাড়া রাখেন নি।...

যার কপালের ওপর দু দুটো জ্বল্‌জ্বলে চোখ আছে, তার তো সবই আছে। এক বাধা—মেয়ে মানুষ!...কিন্তু তারা কি মানুষ নয়? পুরুষের লাম্পট্যের দোর-গোড়ায়, দু হাত যোড় করে তাকে ধরা দিতেই হবে? এ যদি বাস্তবিকই দুনিয়ার নিয়ম হয়, তাহলে সে নিয়ম নয়—দোকানদারী! জুলুম!

সহসা আমার হাতদুটো যুক্ত হয়ে উর্দ্ধে উঠে পড়লো। হৃদয়ের অতি-অন্তঃস্থল থেকে মর্ম্ম-ভাঙা উচ্ছ্বাস ছুটে বেরুলো—

হে শক্তিদাতা পরম পুরুষ! তুমিই কি তা সইবে? তোমারই তৈরী নারী, নিমেষে নিমেষে পুরুষের হস্তপদ-সঙ্কেতে উঠ্‌বে

বস্‌বে—সেকি তোমারই সহিষ্ণুতাকে শাস্তি দেবে প্রভু? আজ আমাকে শপথ কর্‌বার সৎসাহস দাও! আমি যেন লক্ষ লোভী কামান্ধ পুরুষের লালসার অত্যাচারকে পদদলিত করে, অসংখ্য বিপদের সঙ্গে সই পাতাতে পারি! আমি যেন তাদের পায়ের তলে না পড়ি, খোসামুদীর মধুতে না ডুবে যাই, চাক্‌চিক্যের মোহে দৃষ্টি-শক্তি না হারাই!

যুক্ত হাতে ললাট স্পর্শ করে, আঁচল দিয়ে চোখ মুছলাম।

—হ্যাঁ—এইবার দেহে যেন পাগলা হাতীর বল পেয়েছি! তবে আর কেন,—যাত্রাকালে—'দুর্গা-শ্রীহরি' স্মরণ করি।

অতিথি নারীদের একজন এসে পথরোধ করলে। কিন্তু ভয় করবো না—আমার দারুণ পণ!

বললাম—কি চান আপনি?

—কোথায় চলেছ?

—আমার বাবার কাছে।

—সে আবার কোন্‌ দেশে?

—যেখানে হোক্‌—বলবো না। তোমাদের কাউকে আমি বিশ্বাস করি না। ভদ্রলোকের মেয়ে, তবু বিদেশ থেকে এসেও আপন স্বভাব ভুল্‌তে পারো নি। তোমাদের ইয়ার্‌কির আমি যোগ্য নই। পথ ছাড়ো।

মেয়েটি 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

ভেবেছিলাম—হেসে হেসে সে মাটীতে লুটোপুটি খাবে।

কিন্তু দেখলাম—তার মুখখানা বেদনায় টন টন করছে! চোখও

অশ্রু ছল ছল! বললে—রাগের মাথায় সকল দিক্ লক্ষ্য ছিল না, আমি কিন্তু তোমার কথায় একটুও ঠাট্টা বিদ্রূপ করি নি।...

তারপর বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে. আবার বললে—আমারও যে বুকখানা তুষের আগুনে পুড়ে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে! ব্যথায় ব্যথায় দিশেহারা, অন্যের ব্যথায় হাসি আসা কি সম্ভব?...ঢের সহ্য করলাম ভাই! আর কত সইবো? যা সাধ্যের অতীত, তা কেমন করে—

আমি চমকে উঠলাম!—এ আবার কি সুর গায়!...রাক্ষসী মায়া নয় তো! বললাম—তোমরা বড় লোক, পয়সার জোরে ধরাকে সরা দেখ, গরীবের মনের খবর কেমন করে জান্‌বে?...পথ ছাড়ো, সময় আমার এতটুকু নেই।

স্ত্রীলোকটি কাঁদছিল। কাঁদতে কাঁদতেই বললে—একজনের দোষে দলশুদ্ধ সাজা পায়, নিরপরাধীর প্রাণ ফাঁসি-কাঠে ঝোলে—এ কথা নতুন নয়। তোমারই বা দোষ দেব কি?···কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করো বোন্, আমি যা বল্‌বো, তা তোমার ভবিষ্যতে ভাল হোক না হোক্, বর্ত্তমানকে বিপদ্-মুক্ত করবে।

বিশ্বাস তো অনেককেই করেছি, ঠকা ছাড়া জেতার ভাগ্য একবারও পাই নি। আজ না হয় আর একবার ঠক্‌বো। বললাম—কি তুমি বলতে চাও, একটু তাড়াতাড়ি বলো। দেখছো—আমার যাবার সময়···

স্ত্রীলোকটি বললে—দুনিয়ায় আমার এমন কেউ আপনজন নেই, যার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করে বলি—যে, আমি মিছে কথা বলবো

না। তারপর হঠাৎ নিজের চোখ দুটোয় হাত দিয়ে বললে—এই চোখ যাবে, অন্ধ হয়ে পথে পথে বেড়াবো—যদি ভুলেও তোমার কাছে মিথ্যের অভিনয় করি।...তুমি মোহনবাবুকে বিশ্বাস ক'রো না! সে লম্পট, সে শয়তান। আমার মনে হয়—শয়তানের সর্দ্দার সে।...অতিথি তুমি কাকে বলছো ভাই?—এ বাড়ীর অতিথি কেউ নয়। সব বারোমেসে।—তারা রূপ বেচে খায়, পেটের দায়ে বেশ্যাবৃত্তি করে।—মোহনবাবু সেই দেহ-বিক্রীর টাকা থেকে কমিশন ভোগ করে। তা ছাড়া অন্য দিকের জাল-জোচ্চুরি-গুণ্ডামী তো আছেই। এই যে এত বড় বাড়ীখানা দেখছো—এ তার নিজের ভাড়া নেওয়া। ভদ্রলোকের পাড়ায় থাকে, কতশত ভদ্রবেশধারী বাবুর দল তাকে দালালীর টাকা দিয়ে ভেতরে ঢোকে।...যাদের অতিথি সাজিয়েচে, তারাই সব টাকা উপায়ের যন্ত্র। সম্ভবতঃ তোমার কাছে আরো ঢের বানানো কথা বলেছে,—আমি তা শুনিনি, কিন্তু মনে রেখ,—যা বলেছে—তার একবিন্দুও সত্যি নয়। মিথ্যাই যার অলঙ্কার, সত্যকে সে কেন চাইবে?...

আমার পায়ের তলা থেকে মাটীটা সরে যাচ্ছিল। পৃথিবীর আলো-বাতাস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ—সব যেন একাকার হয়ে সাংঘাতিক এক দৈত্যের দেহের মধ্যে ঢুকে গেছে!—আর সে দৈত্য মুখব্যাদান করে আমাকে গিলে খাবার জন্য তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচে!

জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার কি নাম?—

স্ত্রীলোকটি জবাব দিলে—সুলতা।

—কতদিন থেকে জালে পড়েছ?

—আজ পাঁচ মাস।

—পবিত্রতা হারিয়েচ না বাঁচিয়ে রেখেচ?

কাঁদতে কাঁদতে সুলতা বললে—হারিয়েচি ভাই! বাঁচাতে পারি নি। ঐ মোহনবাবুই সর্ব্বনাশ করেছে।...তার পর থেকে আমি লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত সহ্য করে আসচি, তবু ব্যাভিচারের পথে পা বাড়াই নি। বলতে বলতে—পিঠের কাপড় খানা খুলে, দু তিন জায়গার ক্ষত দেখিয়ে বললে—এখনো ঘা শুকোয় নি, তবু তার পাপ মতলবে আমি রাজী হই নি।

জিজ্ঞাসা করলাম—মারলে কেন?

—একটা মাড়োয়ারীকে ডেকে এনেছিল। তার কাছে নাকি অনেক টাকা পাওনা হত। কিন্তু দুর্ব্বল বলে, অসহায় বলে—সে একবার সর্ব্বনাশ করেছে। মুখ বুজে, চোখ বুজে, ডাকাতের ছুরী খাওয়ার মত তা সহ্য করে গেছি। আর কি তা পারি? স্বেচ্ছায় এই দেহটাকে বাজারের পণ্য করবার মত মনের নীচ সাহস কি আমার ছিল ভাই?—না আছে এখনো?

নাঃ—আর অবিশ্বাসের কারণ নেই। ঘায়ের ঠাঁই যে আপনা হতে খুলে দেখায়, তার যাতনার ধ্বনি ছলনার জন্য নয়। বললাম—এবার যে পালাতে হবে সুলতা!—যাবে তুমি আমার সঙ্গে? এই নরকের মায়া কাটিয়ে, ভিখিরী সাজবার সাহস তোমার আছে তো?

সুলতা যেন দুহাতের মুঠোয় স্বর্গটাকে সাপ্‌টে চেপে ধরেচে!... আহ্লাদে আটখানা হয়ে বেচারী চোখের জলে বুকখানা ভাসিয়ে ফেললে।

তিরস্কার করে বললাম—ওকি ভাই !—ওযে অলক্ষণ ! চোখের জলে কেউ কখনো জয়লাভ করতে পারে নি। স্নেহ ছাড়া আর কারো সঙ্গে ও জিনিসটার মিশ্ খায় না। যেখানে স্নেহ নাই, দয়া মায়ার গন্ধ নাই, সেখানে চোখ হবে পাথরের মত শক্ত। মন হবে সাপের মত কুটীল।

আর আমি কথা কাটাকাটির জন্য অনর্থক সময় নিলাম না। এ বাড়ীর মাটী ফুঁড়ে এখনি দোসরা মোহনলাল গজিয়ে উঠতে পারে !

সুলতার হাত ধরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে এলাম।

সরু গলি পার হয়ে বড় রাস্তায় পা দিয়েছি,—কোন্‌দিকে যাবো ভাবচি—সুলতা বললে—তোমাদের বাড়ী ছিল কোন্ দিকে ?

বললাম—সে তো বেলেঘাটার দিকে। কিন্তু আমার সব গোল-মাল হয়ে আসচে সুলতা !...পূর্ব্ব পশ্চিমটা আমায় ঠিক করে দাও দেখি।

সুলতা সুমুখের দিকটাকে উত্তর দিক বললে। তারপর দক্ষিণ মুখো হয়ে বললে—এদিকে গেলে আমরা হ্যারিসন্ রোডে পড়বো। হ্যারিসন রোড থেকে পূর্ব্বদিকে গেলেই বেলেঘাটার রাস্তা পাওয়া যাবে।

আমার মনটা সত্যসত্যই তাজা হয়ে উঠলো যেন। বেলেঘাটা চুলোয় যাক্—আগে ক্যাম্বেল হাঁসপাতালটার চেহারা দেখে বাঁচি।... যেখানে আমার বাবা আছেন,—সে ঠাঁই দূর থেকে দেখলেও, সিকি কষ্ট ভুলতে পারবো।

সুলতা বিস্মিত হয়ে গেল!—সে ভাবে নি যে, পথ চলতে আমি এমন সপ্রতিভ।

তাকে খুব কাছে কাছে করে চলতে চলতে একখানা পোদ্দারের দোকানে এসে হাজির হলাম। হাতে একটা দামী আঙটী ছিল। এ ছাড়া বেচবার মত দ্বিতীয় সম্বল আমার কিছু নেই।

একশো টাকার জিনিস চল্লিশে শেষ করে দিয়ে, টাকা গুলো পেটের কাপড়ে গুঁজে রাখছি,—পেছনদিকের কাপড় ধরে কে টান মারলে!

ও মা! ক'লকাতা সহরটা দিনের বেলাতেও কি চোর ডাকাতের খেলার ময়দান হয়ে গেল!

রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছিল। কিন্তু চেয়ে দেখি—শুধু কাঁপুনি নয়, ফেটে চৌচির হয়ে গেলেও আশ্চর্য্য বলা চল্‌তো না।

—সেই ব্যাটা হতভাগা—পাজীর পা ঝাড়া কেষ্টা! দুপাটি দন্ত বিকাশ করে আমার দিকে চেয়ে রয়েচে!

রাগও হল, আবার অন্তরে অন্তরে দারুণ এক আশঙ্কা এসেও মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে বাসা বেঁধে ফেল্‌লে। কিন্তু রাগ আমি দমন করে ফেললাম। একবারও মুখের কথা না খসিয়ে, যেমন রাস্তা চলছিলাম—তেম্‌নি চলতে সুরু করলাম। সুলতাও ঠিক সঙ্গে আসছিল।

দেখি—অতি অনুগত দাসানুদাসের ন্যায় কেষ্টবাবু আমার পাশে পাশে চলেছেন!—যেন অঞ্চলের নিধি!...ব্যাটা হাড়-হাভাতের কপালে ঢের দুঃখ আছে দেখতে পাচ্ছি। নইলে আবার সঙ্গ ধরে!

যেতে যেতে কেষ্ট কথা কইলে—দিদিমণি, বারে বারে আর

ঠক্‌বো না। মোহনবাবু আস্‌তে আসতেই পাহারাওলা ডাকবো—কি বল?

বিরক্তি ও ক্রোধে আমার কথা বলার জোর হারিয়ে গেছলো। কিন্তু পাল্লায় পড়েছি, মন না যোগালে উদ্ধারের আশা নেই। বললাম—তোর বুদ্ধির দৌড় তো মোহনবাবুর জুতোর সুকতলা অবধি!—সে ঢের ঢের দেখে এসেচি।···কিন্তু এক কাজ কর দেখি কেষ্ট! একখানা গাড়ী ডাক্ দেখি। পায়ে হেঁটে কাঁহাতক চলা যায়!···কোথায় যাচ্ছি জানিস তো?

কেষ্টর তেমনি দন্তবিকাশ ভঙ্গিমা! বললে—হাঁসপাতালে তো?

—হ্যাঁ।...বা তো ভাই!—হাড়-গোড় বেরুনো ঘোড়া আনিস নি যেন, তা হলে গাড়ী মোটেই চলবে না।

কেষ্ট ও-ফুটপাতের একটু দূরে, যেখানে ঘোড়ার গাড়ীর ষ্ট্যাণ্ড্ ছিল, সেইদিকে এগিয়ে গেল।

এদিকে আমিও একখানা ট্যাক্সিওয়ালাকে ডেকে, চুপি চুপি গোটা-কতক কথা কয়েই তার গাড়ীতে চেপে বসলাম। সুলতাও আমার পাশে বসলো।

এতক্ষণে সুলতার মুখ ফুটেচে! জিজ্ঞাসা করলে—ও যে মোহন-বাবুর বাহন!—ওকে আবার জোটালে কেন? ঘর ছেড়ে এলে, তবু বাইরে দাঁড়িয়ে তারই বেড়াজালে বদ্ধ থাক্‌বে?

হাসতে হাসতে বললাম—নামটা যে মোহন, সুলতা!—মাহাত্ম্য যাবে কোথা? তারপর মোটরে বসেই চীৎকার করে ডাক্‌লাম—ওরে কেষ্ট!

কেষ্ট গাড়ী নিয়ে যে আমাদের কাছাকাছি উপস্থিত, তা আমি ডাক্‌বার আগেই টের পেয়েছিলাম।

আমার ডাক শুনেই সে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়লো। তারপর এক লাফে ড্রাইভারের পাশে বসেই, গম্ভীরভাবে হুকুম জারী করে দিলে—'চালাও সিধা'—

ড্রাইভার কিন্তু গাড়ীখানা ভোঁ শব্দে বিপরীত দিকে চালিয়ে দিলে।

কেষ্ট বরাবরই খুব চালাক চতুর। ড্রাইভারের দুরভিসন্ধি সে এক সেকেণ্ড যেতে না যেতেই ধরে ফেলেচে। সুতরাং চীৎকার করতে লাগলো—দিদিমণি গাড়ীর নম্বর টুকে নাও।—তারপর—'এই পুলিশ' 'পুলিশ—পাহারাওলা'—'সার্জেন'...এমন কি খোদ পুলিশ কমিশনারের সন্ধান জানা থাক্‌লে, তাকেও সে ডাক্‌তো।

সুলতা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে—এ যে তবু গুলো ভাল দিদি! ...খোঁচা খেয়েই প্রাণটা হারাতে হবে...

আমি গম্ভীরভাবে জবাব দিলাম—তা ছাড়া আর উপায় কি সুলতা!...তবু এ বীরের মৃত্যু! ভীরুর নয়।......

......ড্রাইভার সাহেব যে আড্ডার সুমুখে ট্যাক্সি থামালে, সে আড্ডার চেহারা দেখেই—কেষ্টচন্দর ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চাইতে লাগলো।

সেই যখন থেকে সে বেয়াড়া ধরণের চীৎকার সুরু করেছিল—তখন থেকেই ড্রাইভার তাকে দস্তুর মত বগলদাবা করে পাশটিতে

ফেলে রেখেছিল। এতক্ষণে বললে—উঠিয়ে বাবু!—আপ কা খুসীকো-ওয়াস্তে পুলিশ লোক্‌কা ডেরামে হাজির কর দিয়া।

একজন ভদ্রলোক আমাদের গাড়ীখানার কাছাকাছি এসে দাঁড়াতেই আমি বিনীতভাবে জান্‌তে চাইলাম—তিনি কে।

উত্তর পেলাম—থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ-কর্ম্মচারী।

নমস্কার করে গাড়ী থেকে নেমে, আমার একান্ত স্নেহাশ্রিত শ্রীমান কেষ্টচন্দর ভায়াজীবনকে দেখিয়ে দিয়ে বললাম—আপনি বাঙালী, যদি ভদ্রমহিলার সম্রমের ওপর আপনার বিশ্বাস থাকে, তা হ'লে অনুরোধ করছি—এই চোরটাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক হাতকড়ি লাগাবার হুকুম দিন। ওর দ্বারা আমি এত বেশী দুর্দ্দশা পেয়েছি,—যা আজো পর্য্যন্ত কেউ কোন দিন পায় নি।...কোনো লোকে কল্পনাতেও সে সব বিপদের ব্যাপার এঁকে নিতে পারবে না।...গভর্ণমেণ্ট নিজেই যাতে মকদ্দমা চালান, সে ব্যবস্থা, আশা করি আপনি করে নেবেন। তা ছাড়া যদি দরকার হয় আমি প্রধান সাক্ষী হয়ে কোর্টে হাজির থাকবো।...বলে, অবশ্য বেলেঘাটার ঠিকানাই তাঁকে দিয়ে দিলাম।

পুলিশবাবুটি তখন অধীনস্থ কনষ্টেবল্‌দের ওপর হুকুম জারী করে দিয়েছেন। কেষ্টচন্দর হাতে বেড়ী পরে থানার বারান্দাঘরে দণ্ডায়মান। ঘন ঘন রোদনের সাড়া দিচ্ছেন, মিনিটে মিনিটে গলা ঝাড়া হচ্ছে,—তা ছাড়া রঙ-বেরঙের পেশাদারী কসরৎ তো আছেই।

মনটায় ভরসা এলো—কাঁটা দিয়ে যদি কাঁটা তোলা যায়, তা হলে আজ কেষ্টার দ্বারা মোহনবাবুকেও জালে পড়তে হবে।

ইন্‌স্পেক্টারবাবুর প্রয়োজনমত কথার জবাব দিয়ে এবং আমার

প্রয়োজন তাঁকে জানিয়ে, সেই ট্যাক্সিতেই আমরা ক্যাম্বেলে রওনা হলাম।—আসবার সময় ইন্‌স্পেক্টরবাবুকে বলে আস্‌তে ভুলিনি যে, দরকারের সময় আমরা দুজনেই প্রধান সাক্ষী হতে পারবো।

থানার লোকে এইরকমের কেস নেয়—কি নেয় না, তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু আমাদের কাছে নিলে। অবশ্য এ ভগবানের দয়াতেই।……

ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের সদর গেটে যখন আমাদের ট্যাক্সিখানা ঢুক্‌লো,—তখন বুকের মাঝে হাতুড়ি পেটার শব্দ সুরু হয়েচে!… আহা রে!—এযে আমার কত দীর্ঘ বিরহাবসানের পর পিতৃচরণ-সন্দর্শন!…মধুসূদন! দুঃখ যা দিয়েছ মাথায় করে ব'য়েছি,—এইবার কিনারায় পৌঁছে দিয়ো ঠাকুর! আমার বাবার বড় এ জগতে কেউ নাই—কিছু নাই।

ট্যাক্সিওলাকে ছেড়ে দিলাম না। সুলতাকে গাড়ীর মধ্যে বসিয়ে রেখে, আমি হাঁসপাতালের আফিস ঘরে ঢুকলাম—বাবার খোঁজ খবর জান্‌তে।

দশ পনের মিনিট পরে যখন আফিস থেকে বেরিয়ে এলাম—তখন চেয়ে দেখি—আকাশের সূর্য্যটা কী অসম্ভব রকম কালো!… ক'লকাতা সহরটা কি সত্যসত্যই পাতালপুরীর অন্ধ গহ্বরে তলিয়ে গেছে!…

—'রামলোচনবাবু' নামে একজনও রোগী গত সাতদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত হাঁসপাতালে আসে নি। কোথাও কোনখানে উক্ত

নাম লেখা নাই। খাতাপত্র যেখানে যা আছে, হাউস-সার্জ্জেন এবং কেরাণীবাবুরা তন্ন তন্ন করে দেখেও কিছু বের করতে পারলেন না।

অকূলে ভাসতে ভাসতে আজ তৃণখণ্ডই আমার সব চেয়ে বড় আশ্রয় হয়ে দাঁড়ালো।—কেউ নেই, কাজেই স্থলতাই আমার একমাত্র অভি-ভাবিকা! তারই বুকের মধ্যে দুর্ব্বল মাথাটা চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললাম—কি হবে স্থলতা!—আমি যে ধনে প্রাণে গেলাম!...চোর দমবাজ যারা, তাদের কি প্রাণের মধ্যে এতটুকু মমতার সাড়া নেই! মানুষ মানুষকে এমনি করেই কি ধ্বংসের পথে টান্‌তে পারে! সবল কি চিরকালই দুর্ব্বলের মাথায় জুতোর টোকর দিয়ে বাহবা নেবে?

স্থলতা ক্ষীণ হাসি হেসে বললে—এ বাহবা নেওয়া নয় ভাই,—এ অন্তর্য্যামীর কাছে জেরায় হেরে যাওয়া!...কিন্তু সাজা ভগবানের ভাণ্ডারে জমা হয়ে রইলো—সময় বুঝে একদিন তিনিই তা ভাগ করে দেবেন।...

গাড়ী চলছিল—বেলেঘাটার পথে।

স্থলতা জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় যাচ্ছো ভাই?

ভয়ে ভয়ে জবাব দিলাম—নিজের একখানা বাড়ী আছে, সেখানে যাওয়াই উচিত মনে হচ্ছে স্থলতা! নয় কি? বাবার তত্ত্বটা যোগাড় করতে না পারলে আমি কিছুতেই আর সামলাতে পারবো না। তুমি তো জানো না স্থলতা! আমার মা নেই, কিন্তু বাবার বুকে তাঁর অক্ষয় আসন পাতা আছে! তিনি আমার বাবা-মা একসঙ্গে দুই-ই।

স্থলতা ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগলো।

সুপ্রিয়ার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ হ'তে তখন পিতৃ-প্রশংসার ধারা নেমে আসছিল—এমন মহাদেবের মত লোক ভূভারতে আর দুটি নেই ভাই! এতটুকু মিষ্টি কথায় তিনি আপন জীবনটাকেও বিসর্জ্জন দিতে চান, যদি কারো উপকার করতে পারেন, তার তৃপ্তির সাফল্যটুকু বুকে করে,—আহার নিদ্রাকেও আমলে দেন না। নইলে আজ হতভাগা জোচ্চোরের কারসাজীতে ভুলে, আমাকে পথে পথে কেঁদে বেড়াতে হয়? তুমি তো জানো না সুলতা! এই মোহনবাবুর মিষ্টি কথায় ভুলে, বাবা আমাদের যথাসর্ব্বস্বই হারিয়ে ফেলেচেন! নগদ পুঁজিপাটা যা ছিল—এক আধ্‌লাও আর অবশিষ্ট নেই! সব গেছে কিন্তু দুঃখ করি না বোন্, যদি আজ বাবাকে ফিরে পাই। আমার বড় আগুনে জল ঢালা ধন পিতৃস্নেহ! এতবড় ধূমধামের বিশ্বসংসারে আর আপন বল্‌তে কিচ্ছু নেই আমার।...

সুলতাকে আর কথা কইবার সময় দিলাম না, গলির মধ্যে ট্যাক্সি-খানা এসে লাগ্‌তেই, তার হাত ধরে নেমে পড়লাম। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে, গলিটার পানে যখন চাইলাম—তখন কোথায় ছিল—সপ্তসিন্ধুর বারি,—আজ যেন প্রলয়-কল্লোলের মাতন নিয়ে আমার দুটি চক্ষুকে ক্লান্ত করে তুল্‌লে। হায়রে সর্ব্বহারা হতভাগী!—তোর ভাগ্য-হত ভাগ্যে আরো কত কি দেখ্‌বার আছে!

ইচ্ছা হয় না—চরণ চলে না, তবু যেতে হল। বাড়ী না গিয়ে কোন্ যমপুরীতে যাবো? সব দিকের পথই যে চিররুদ্ধ হয়ে গেছে! কিন্তু—যদি মোহনবাবুর দুষ্ট বুদ্ধির ঘোর প্যাঁচ বাড়ীর মধ্যেও জমা হয়ে থাকে, তাহলে মরণ ছাড়া আর বাঁচবার কোন উপায়ই থাক্‌বে না!

সুলতার অচেনা ঠাঁই। কোথায় আমি তাকে হাত ধরে চিনিয়ে নিয়ে যাবো,—তা না আজ তাকেই আমার মৃদু-কম্পিত আড়ষ্ট দেহটার ভার নিতে হল। সুলতার কাঁধে ভর করে কোনরকমে বাড়ির গোড়ায় এসে পৌঁছলাম।

আমার সাতজন্মকার গোছা ঘরাত্...এযে ঘর দোরের জানালা কপাট পর্য্যন্ত কে চুরি করে পালিয়েচে!

সুলতা বললে—এখন কি হবে দিদি?...আমার অদৃষ্টদোষেই আজ তোমাকে এত জ্বালায় পড়তে হল। আমার পরশেই—সোনার ঘর দোর তোমার চোরের আড্ডাখানা।

আমি হেসে উঠলাম। না হেসেই বা করি কি! শোক যখন সাংঘাতিক হয়ে ওঠে,—তখন কান্না লুকিয়ে পড়ে,—হাসি আসে—কান্নার চেয়ে ভয়ানক মূর্ত্তি ধরে। আপন সান্ত্বনা ছানিয়া খুঁজে পাওয়া যায় না, তবু অভাগী সুলতাকে শান্ত রাখার গুরুভার, কেন জানিনে—ভগবান আমারই হাতে তুলে দিয়েছেন। বললাম—[illegible] বাধা বুলি ছেড়ে দাও সুলতা। [illegible] কোনোখানে হয়তো আমার পায়ে, কিন্তু তোমার-আমার [illegible] তার [illegible] নেই। তোমার [illegible] যখন চোখের দেখাটুকু পর্য্যন্ত হয়নি, তখন [illegible] পড়বে আমার [illegible] বিপদ হল সুলতা? কার পরশে আমি [illegible] ব্যভিচারীর [illegible] পড়লাম? বরং তোমার মত পুণ্যশীলার [illegible] [illegible] সর্ব্বনাশের শেষ [illegible] থেকে [illegible] [illegible]

কিন্তু [illegible] কি করি? এমন [illegible]

ততখানি সাহস তো তোমার আমার কারো নেই সুলতা!...তা ছাড়া সহায়হীন হয়ে আমরা পাতালপুরীতে আশ্রয় নিলেও মোহনবাবুর চোখে ধুলো দিতে পারবো না। আবার বিপন্ন হবো, হয়তো বা এর চেয়েও ঢের উঁচুদরের সর্ব্বনাশকে বুক পেতে বরণ করতে হবে।...

সুলতা বললে—চোর-ডাকাতের ভয়টাও—

আমি আবার হেসে ফেললাম। তেমনি কান্নার হাসি! বললাম—চোর-ডাকাতের ভয়—আমি কখনো করবো না সুলতা! তাদের ঠেকিয়ে রাখার মতন সাহস আমার আছেই, কিন্তু মোহনবাবুকে বাধা দেওয়ার শক্তিলাভ আজো হয় নি ভাই! হত্যাকারীর ছোরাকে বরং সহ্য করা চলে, কিন্তু বিষ লুকোনো অন্তরের মধুমাখা কথা—সকল লোকেরই সহিষ্ণুতার বাইরে। হতভাগা আবার যদি আক্রমণ করে,...করে কি করবেই।

সুলতা কাঁদতে লাগলো। তবু তাকে ভাগ্যবতী বলতে হবে।—কাঁদবার অবসর পেয়েছে!

দুজনের ভয়-ভাবনার আদি-অন্ত নেই—একজন প্রতিবেশী এসে দাঁড়ালো।

জিজ্ঞাসা করলাম—ঘর-দোরের—এমন অবস্থা কে করলে জানো?

লোকটি জবাব দিলে—কেন তোমরাই তো সব বেচে ফেলেচ! রামকানাই কুড়িটাকায় খরিদ করলে। সেদিন তোমার সেই কাকাবাবু না দাদাবাবু এসে বিক্রী করে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম—বাবুরা সব কোথায় আছে? বললে—কাশীবাস করছে। তা তুমি এলে,—কত্তাবাবু বুঝি সেখানে রইলেন?

সুলতাকে বললাম—কাকাবাবু না দাদাবাবু কে বুঝেচ ? কিন্তু আমি এই বৈচিত্র্যটুকু কিছুতেই বুঝতে পারলাম না ভাই !—ভগবানের কি উদ্দেশ্য এরা সাধন করে ! তারপর প্রতিবেশীকে বললাম—কত্তাবাবুর কথা পরে বলবো। কিন্তু রামকানাইকে তো আমি চিনি না বাপু !

তুমি বল্‌তে পারো— দরজার কপাটগুলো সে রেখেচে না কাজে লাগিয়েচে ?

প্রতিবেশী বললে—সেইদিনই কাজে লাগিয়েচে।

চোরাই মাল্ হোক্—তবু গরীব বেচারা তার রক্ত জলকরা পয়সা দিয়ে খরিদ করেছে !···ভোগ করুক, আমার মত অশান্তির বাতাস যেন তার গায়ে না লাগে।

প্রতিবেশী তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। মিনতির সুরে বললাম—অন্ধকারে ঘরের ভেতরটা নজর পড়ে না, একটা আলো আনবে বাপু ? একটিবার দেখেই—তোমাকে ছুটী দেব।

লোকটা চলে গেল। অমনি আমি সুলতার হাত ধরে বললাম—কথা কস্ নে দিদি ! চল্ বেরিয়ে পড়ি।

সুলতা বিস্মিত হয়ে বললে—কিন্তু লোকটি যে আলো আন্‌তে গেছে ?

—তা যাক্ ! ঠেকে ঠেকে ঢের শিখ্‌লাম। আবার কি আমাকে ঠক্‌তে বলবি দিদি ? ও যদি মোহনবাবুর চর হয় ?···বিশ্বাস বলে কোন কথা আছে—এ বিশ্বাসই আজ মন থেকে ধুয়ে ফেল্‌তে হবে। বিপদ থেকে বাঁচবার উপায় অন্য কিছু নেই। বলেই সুলতার হাত ধরে গলি পাড় হয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লাম।

—কিন্তু তারপর? ..যাই কোথা? ..সেখানে?—রত্নাকরবাবুর বাসায়?…কিন্তু আর তো আমার পথ নেই!…যখন মোহনবাবুর ছলনার কারাগারে বন্দী ছিলাম—তখন নিমেষে নিমেষে যার কথা মনে হয়ে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেচে—সে ছাড়া আর কাকে আজ ভাবুবো? পরোপকারের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা যার মুখে চোখে প্রতিভাত দেখেছিলাম—তার কাছে অসহায়ার বেশে গিয়ে দাঁড়াতে, বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা আসা আমার উচিত নয়।

একখানা ট্যাক্সি কি গাড়ীর জন্য চারধার লক্ষ্য করতে করতে পথ চলেছিলাম, কিন্তু লক্ষ্য করাই সার হল। চলতে চলতে রত্নাকরবাবুর বাসার দরজায় পৌঁছে গেলাম।

ভিতরের ঘরখানায় আলো জলছিল। সদর দরজাটা ঠেলে দেখি—ভিতর থেকে বন্ধ। জোরে কড়া নাড়লাম।

খানিক পরে যে দোর খুলে দিলে,—সে 'উড়ে খানসামা' নয়—অন্য একজন ভদ্রলোক।

বিস্মিত হয়ে ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করলে—কাকে চান?

আমার গলাটায় কে যেন পাথর চাপিয়ে গেছে!—কথা বলতে চাই স্বর আটকে আসে। কোন রকমে জবাব দিলাম—রত্নাকর বাবুকে চাই।

ভদ্রলোকটি জবাব দিলেন—তিনি তো নেই!

হা মা! বসুন্ধরা!, সীতার দুঃখ সইতে না পেরে আপন বুক থেকে তার জন্য সিংহাসন তুলে ধরেছিলে, কোলে স্থান দিয়েছিলে,

জল মুছিয়ে দিয়েছিলে,—আমার দুঃখ কি তার চেয়ে কম? আমি কি মা তোমার কন্যা নই?

জিজ্ঞাসা করলাম—কখন ফিরবেন জানেন?

উত্তর পেলাম—রত্নাকরবাবু ঘণ্টাখানেক আগে তাঁর দেশে রওনা হয়ে গেছেন।...তাঁর এক বিশিষ্ট আত্মীয়ের অসুখ!

আত্মীয় বলতে তাঁর মা ছাড়া অন্য কেউ আছে কি না জানি না। কিন্তু জানবার সময়ই বা কতটুকু পেয়েছিলাম। সামান্য কয়েক ঘণ্টার পরিচয়। অথচ তাকেই প্রধান ভেবে আমি মহাবিপদের সময় আশ্রয় ভিক্ষা করতে এসেচি। লজ্জা হল। অথচ সেই লজ্জাই আজ আমাকে গ্লানিতে মলিন করে দিলে! দেব-চরিত্রের ওপর সন্দেহ! যতক্ষণেরই আলাপ হোক—তিনি যে দেবতা! দেবতার দোরে আশ্রয় চেয়ে মানুষ কখনো আত্মমর্য্যাদা হারায় না, বরং মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়।

ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম—এবাড়ীতে কে কে আছেন? আমি জান্‌তাম—রত্নাকরবাবু এখানে একা বাস করতেন।

ভদ্রলোক বললেন—এখনো একাই। আমরা জনকতক তার ক্লাসফ্রেণ্ড,—বেড়াতে এসেচি। সে চলে গেছে বটে, কিন্তু ঘরদোরে চাবি দিয়ে যায় নি।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনারা সবাই ডাক্তার?

—না, তবে মেডিকেল কলেজে পড়ি। তারপর সামান্য একটুখানি হেসে বললেন—অবশ্য ভবিষ্যতে ডাক্তার হবার আশা রাখি। কিন্তু আপনার কি খুব বেশী কাজ ছিল? রত্নাকরকে না হলে চলবে না?

কারো অসুখ বিসুখ হয়ে থাকে তো বলুন ··আমরা এখন পাঁচজন হাজির রয়েছি। সাধ্যমত সাহায্য করবো।

যেখানে ছলনার নাম-গন্ধ থা:কে না, সেখানে ছলনা করাই যার পেশা, সে-ও স্বভাবের ভাব দেখাতে কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠে। ভে:বছিলাম সহজে যার-তার কাছে সত্যকথা কইবো না। কিন্তু এখানে সে প্রতিজ্ঞা আমার স্থায়ী হ'ল না। সত্যটাই বলি বলি করছি—

ভদ্রলোকটি অত্যন্ত বিনীত হয়ে বললেন—অনুগ্রহ করে বাড়ীর মধ্যে আসুন! কি আপনার বক্তব্য বলুন! সাধ্যপক্ষে আমরা সাহায্য করবো।

আমি বললাম—আমরা বিপন্ন। রত্নাকরবাবুর কাছে সাহায্যের জন্য এসেছিলাম।...অসুখ-বিসুখ নয়, অন্য রকম সাহায্য।

আশ্চর্য্য! ভদ্রলোকটি পকেট থেকে এক ছড়া চাবি বের করে, আমার দিকে এ গিয়ে ধরে বললেন—রত্নাকরের টাকা পয়সার ভাণ্ডারও আজ আমার হাতে।···কি চান আপনি বলুন?

আমি অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে বললাম—টাকার জন্যে তো আসি নি।...

ভদ্রলোক তবুও আমার প্রতি দৃঢ় সরল বিশ্বাস রাখলেন। বললেন—আপনি দ্বিধা করছেন কেন? এতক্ষণে আমার মনে পড়েছে···কিছু ভাববেন না...আপনিই কি সুপ্রিয়া বোস?

এ আবার কি প্রহেলিকা!...মোহনবাবুর চর নয় তো!···নাম জানলে কেমন করে!

ভদ্রলোক রত্নাকরবাবুর সম্বন্ধে অনেক রকম জানা কথার আলোচনা

করে, আরো বেশী রকম বিস্মিত করে তুললেন। বললেন—আপনার কথা বহুবার শুনেচি। কিন্তু মাপ করবেন, আপনিই তো মিস্ বোস ?

আমি সলজ্জ হয়ে গেলাম—কেন তা জানি না। বললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ।...কিন্তু আমার যে বড় দরকার ছিল—

আপনি খুলে বলুন। বলবার আগে শুনে রাখুন, রত্নাকরের বিশিষ্ট বন্ধু বলতে যদি কেউ থাকে তো রণজিৎ ঘোষ। আমাকে বললে আপনি ঠক্‌বেন না। অবশ্য যদি বলার প্রয়োজন বোধ করেন।

সত্য কথা বলতে কি, প্রতারণার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে এসেচি, প্রতারণার ফাঁদে আর পা দেব না বলে সাবধানতা অবলম্বনের সহস্র চেষ্টা করছি, তবু এই রণজিৎ বাবুটীকে বিশ্বাস না করে থাক্‌তে পারলাম না। বিশেষতঃ দৃঢ় বিশ্বাসের পাকা ইমারত যদি কোথাও থাকে, তো এই রত্নাকরবাবুর আবাসে। অন্ততঃ আমার মতে। কাজেই অন্তরের কথা বলতে আর সমীহ করলাম না। বললাম—আজকের রাত্রিটা আমাদের কালরাত্রি। আশ্রয় নেই, যদি ভরসা দেন...

রণজিৎবাবু শশব্যস্তে বলে উঠলেন—আসুন আসুন। এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন কি আমাকে পরীক্ষা করবার জন্যে ?...

ভদ্র বলে কারো কপালে ছাপ মারা থাকে না, ভদ্রতা প্রকাশ পায় তার আচারে, কথাবার্ত্তায়। রণজিৎবাবু ভুলেও একটিবার জান্‌তে চাইলেন না যে,—আশ্রয়হারা কেন ? বা আমার সঙ্গে যে স্থূলতা রয়েচে তারই বা পরিচয় কি ?...

পাশেই ছিল বৈঠকখানা। খুব ছোট্ট, নেহাৎ অব্যবহার্য্য একটা

কুঠুরী।...বৈঠক বসে না তবু এর নাম বৈঠকখানা। সেই ঘরের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে, রণজিৎ বাবু বললেন—আমার বিশ্বাস, দোষ নেবেন না।...ওপরে যারা গল্প গুজব করছে, তাদের সকলকার সাম্‌নে আপনাকে হাজির করতে আমার ইচ্ছা নেই।...বেশী না দশ মিনিট এখানে অপেক্ষা করলেই আমি ও ঘর খালি করে দেব।...আমরা তো আজ তিন দিন ক'লকাতা ছাড়া। বিয়ের বরযাত্রী গেছলাম।... রত্নাকর যায় নি, তার নাকি বৈষয়িক কাজ ছিল। দেশের অনেক কাজকর্ম্ম এখানে বসেও তাকে দেখতে শুন্‌তে হয় কিনা।...সকালে হোষ্টেলে ফিরেচি, সন্ধ্যেয় যখন এখানে হাজির হলাম, তখন রত্নাকর দেশে যাওয়ার জন্যে তৈরী। কাজের কথা একটাও হয় নি, খালি যাবার সময় বাক্স-প্যাটরা আর ঘরকন্নার চাবিগুলো গছিয়ে দিয়ে গেছে।...উড়ে চাকরটাকেও সঙ্গে নিত না, কিন্তু আমরা আস্‌তেই, তাকে নিয়ে গেল। বললে—'রাত্রির বেলায় বাড়ীতে এসে হট্টগোল করিস। দিনমানে একজন হোষ্টেলের দারোয়ান্‌কে পাহারায় রাখিস্।' ...একদম্ খেয়ালি লোক !...

রণজিৎ দ্বিতলে উঠে গেলে, সুলতা জিজ্ঞাসা করলে— এদের মধ্যে সে নেই তো ভাই ?

আমি হাসলাম, অথচ ভয়ে ভয়ে জবাব দিলাম—ধরে রাখো হয়তো আছে। সাবধান হতে হলেই, বিপদের কথা স্মরণ রাখতে হয়। যখন যে কোন অজানা লোকের সঙ্গে কথা কইবে, তখনই মোহনবাবুর ছবিখানা যেন চোখের সাম্‌নে ফুটে ওঠে ! সেইটুকুই হবে আমাদের কবচ।

সুলতা বললে—কিন্তু এই ভদ্রলোক সত্যিসত্যিই ভদ্র। আমি অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। সুলতার কথার জবাব দিতে সময় পেলাম না।—

রণজিৎ বাবু এসে বললেন—আসুন আপনারা!...

...সেই ঘর। যে ঘরে একদিন, একবেলায় একমাসের কথা কয়ে ধন্য হয়েছিলাম! সব তেমনি সাজানো,—নাই শুধু—মালিক। মালিকের অনুপস্থিতি, আমাকে পীড়া দিতে লাগলো। এ যেন জোর করে নেওয়া! দেনাপাওনার হিসেব নেই,—তাগাদার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌লাম।...রত্নাকর বাবুর বন্ধুরা দ্বিতল ছেড়ে একতলায় আশ্রয় নিলে।

কিন্তু কি সুন্দর ভদ্রতা! একটা ছোটখাটো গোলমালও কানে এলো না।

সুলতা বললে—আশ্রয় তো পেলে। তারপর—কাল সকালে?

আমি ডান হাতটা আকাশের দিকে খাড়া করে বললাম—ওখান থেকে যা ব্যবস্থা আসবে—তাই করবো। অবস্থার বাইরে গিয়ে পড়লেই ভগবান ছাড়া পথ থাকে না সুলতা! সেই জন্যেই তো তাঁর মধুসূদন নাম। বিপদ না হলে মানুষ তাঁকে ভজনা করে না।

সুলতা জিজ্ঞাসা করলে—রত্নাকরবাবুটি কে ভাই? তোমার আত্মীয়?

—হ্যাঁ সুলতা!—আত্মীয় না হলে, বিপদের সময় কি মোহন বাবুর আত্মীয়ের কথা আমার মনে এসেচে? এই দেখ—কেমন

কথায় কথায়—প্রত্যেক খুঁটিনাটির মধ্যেও আমি মোহনবাবুকে মনে রেখেছি।...এতক্ষণে সাহস পাচ্ছি—হয়তো বিপদ কাটলো।

এম্‌নি সময়—রণজিৎবাবু ঘরে ঢুকলেন। জিজ্ঞাসা করলাম—আপনাদের খাওয়া হয়ে গেছে?

একগাল হাসি হেসে রণজিৎবাবু বলে উঠ্‌লেন—সাধে কি আমাদের সেকেলে লোকে বলে গেছে—নারী জননীস্বরূপিনী! আপনারা খাবেন না খাবেন এতক্ষণের মধ্যে একটিবার ভুলেও জিজ্ঞাসা করিনি, কিন্তু আপনার কর্ত্তব্য আপনি পালন করলেন। আমাদের খাওয়া না খাওয়ার ভাবনা আপনি ভাববেন না সুপ্রিয়াদেবী! হোটেলের ভাত—সমস্ত রাত্রিটাই থালা চাপা হয়ে মজুত থাক্‌বে। এখন আপনাদের ব্যবস্থা কি করবো তার হুকুম দিন!

বললাম—মনে যার চৌষট্টি জ্বালার অগ্নিকুণ্ড সাজানো, খিদে-তেষ্টায় তাকে কাহিল করে না রণজিৎবাবু! কিন্তু...কিরে সুলতা! খাবি?

রণজিৎবাবু সহর্ষে বললেন—ওঁর নাম বুঝি সুলতাদেবী? তারপর দু হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার জানালেন। বললেন—লক্ষ্য দোষে দোষী আমি! আমাকে মাপ করবেন।

সুলতা ও আমি ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রয়েছি, রণজিৎবাবু আবার বললেন—মার্জ্জনা করুন সুলতাদেবী! এতক্ষণের মধ্যে একটিবারও আপনাকে সম্মান দেখাতে চাইনি,—সেজন্যে অপরাধের অন্ত নেই।...আমরা আবার ভদ্রতার অহঙ্কার করি!

সুলতা লজ্জায় নুয়ে পড়ছিল। তার ভাবগতিক দেখে আমাকেই

কথা কইতে হ'ল। বললাম—সুলতার সামনে যদি ওরকম ভাবে কাকুতি মিনতির কসরৎ দেখান, তা হলে অপমৃত্যুর পাতকভাগী হতে হবে। ও বেচারা যেমন লাজুক, তেমনি বোকা হাবা। ও সব আদব-কায়দা তো জানে না। বরং আপনিই আমাদের মার্জ্জনা করুন। রাত্রিকালে, এক কথায় বন্ধুর ঘর থেকে বন্ধুকে সরিয়ে দিয়েছি—অপরাধের সীমা সংখ্যা তো আমাদেরই নাই !...কিন্তু ওরা সব কোন্ ঘরে রয়েচেন ?

রণজিৎবাবু স্মিতমুখে বললেন—তারা তো নেই ! সব বাড়ী চলে গেল। বাড়ী অর্থে হট্টমন্দির !—বলেই হেসে উঠ্‌লেন।

আমার লজ্জা রাখবার আর ঠাঁই মেলে না! বললাম—আশ্রয় তো দিলেন রণজিৎবাবু! কিন্তু আশ্রয়-প্রার্থীকে অপমান করাই কি আশ্রয়দাতার ধর্ম্ম ?

এই সময় সুলতা বলে উঠ্‌লো—আপনি কি খাবেন? ওরা তো হট্টমন্দিরে চলে গেছেন।

রণজিৎবাবু হাসলেন।—খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সব চাইতে বেশী হলেও, অতি প্রয়োজনের কাছে—তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। আজ যদি সমস্ত রাত্রি ধরে আপনাদের সঙ্গে গল্প করি, অথবা আপনাদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখি, তা হলে খাওয়ার প্রয়োজনটুকু আমার মনে থাকবে না সুলতাদেবী! কিন্তু সত্যি আমি ঠাট্টা করি নি।...সম্ভ্রান্ত ভেবে পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করলুম, আমাকে অপমানিত করাই কি আপনাদের ইচ্ছা ?...কিছু না খেলে—

আমি কথা কইলাম না। সুলতাই জবাব দিলে—অপমানিত

করার লোভ আপনারও তো কম দেখচি না মশায়!...কাটা ঘায়ে নুণ ছড়ালে কি ব্যথা যায়?...পেটের জ্বালাটাই ভুলে গেছি যে! দেহ-মন পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে,—খাবে কে?...সুপ্রিয়া দেবীর কথা কি আপনি এরই মধ্যে ভুলে গেলেন?

সহসা দুটি হাত যোড় করে, রণজিৎবাবু বলে উঠলেন—প্রয়োজন হওয়া মাত্রই যেন জানাবেন। আপনারা যদি লজ্জা দেখান, তা হলে সে লজ্জা অপরাধ হয়ে আমাকে শাস্তি দেবে।

সুলতা বললে—আপনাকে শাস্তি দেওয়ার মহাপাপ আমরা কদাচ করবো না। খিদে পেলেই খাবারের জন্য জুলুম করবো।...

—তাহলে আপনারা শুয়ে পড়ুন!—আমি নীচের ঘরে রইলাম। দরকার হলেই ডাক্‌বেন। এক ডাকের বেশী দু'ডাক্ দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।

আমি অবাক্ হয়ে গেলাম!—সে কি! আপনি জেগে থাক্‌বেন না কি? কিন্তু কেন রণজিৎবাবু?...

রণজিৎবাবু জবাব দিলেন—রত্নাকর আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু, আজ যদি তার অনুপস্থিতিতে, এই বাড়ীখানা, আর আসবাবপত্র টাকা কড়ি সমেত, সমস্ত কিছুরই চার্জ্জ বুঝে নিয়ে আমাকে অব্যাহতি দিতে পারেন সুপ্রিয়া দেবী, তা হলে ঐ নীচের স্যাঁতসেঁতে ঘরখানায় রাত কাটাবার পন্থাকে আমি ঘৃণা করে বাড়ী চলে যাই।...

জিজ্ঞাসা করলাম—কিন্তু এর মানেটা তো বোঝা গেল না?

রণজিৎবাবু বললেন—মানে বোঝা হয় তো সোজা নয়। কিন্তু জেনে রাখুন—রত্নাকর আপনার সম্বন্ধে আমাকে যা জানিয়েছিল,

তাতে করে এইটুকু ধারণা করে রেখেছি,—কয়েক ঘণ্টার আলাপে সে আপনার ওপর এত বেশী বিশ্বাস রাখে যে, সহস্র বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়ের মাঝখানেও তার অনুপস্থিতির বেদনা হয়তো আপনাকেই বেশী বাজবে।

সুলতা বলে উঠলো—তা হলে আপনি কি নীচের ঘরেই থাকবেন ?—ঐ স্যাঁতসেতে—

রণজিৎ হাস্‌তে হাস্‌তে বললে—আমরা না থাকলে, রত্নাকর বাসায় চাবি দিয়ে যেতো। তখন আপনারা কোথায় আশ্রয় পেতেন সুলতা দেবী ?···গাছতলায় হলেও তা আশ্রয়।...বিপদে মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকুই বিপন্নের অমরাবতী।

সুলতা বললে—তবে আমাদের আসায় আপনি বিপন্ন ?

রণজিৎ বললেন—দায়ীত্ব মাথায় চাপ্‌লে, বিপদের কথা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখতে হয়, নইলে দায়ীত্বজ্ঞান বজায় থাকে না। আপনারা রত্নাকরের আশ্রয়ে এলেও আজ আমারই আশ্রিত। সুতরাং আপনাদের পরিচর্য্যার দায়ীত্ব নিয়ে আমাকে চিন্তিত থাকৃতে হবে। অন্ততঃ তাই উচিত।

আমি বললাম—কর্ত্তব্যচ্যুত করবার দুঃসাহস রাখবো না। আপনি যথা খুসী করুন।...কিন্তু একটা কথা—মেদিনীপুর যাওয়ার গাড়ীটা কখন জানেন ?

বিস্মিত রণজিৎ বলে উঠলেন—কেন সুপ্রিয়া দেবী ?—রত্নাকরের বাড়ী পর্য্যন্ত যাবার সঙ্কল্প না কি ?···অথচ বিপদের এতটুকু কারণ আমি শুন্‌তে পেলাম না।

আমি মাথা হেঁট করে বসে রইলাম।...চোখের পুরোভাগে, মোহনলালের মূর্ত্তিখানা তখন জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছিল !



সারারাত্রির মধ্যে ঘুম আসার মত মনের অবস্থা আমি একবারও পাই নি।…দুশ্চিন্তা যেখানে একাধিপত্য করে,সুনিদ্রার প্রবেশ সেখানে চিরনিষিদ্ধ। কিন্তু সুলতার ঘুম এসেছিল। খুব ভোর বেলায় তাকে জাগিয়ে দিয়ে বললাম—কাল রণজিৎবাবু ট্রেণের সময়টা কি বলেছিলেন? তোর মনে আছে?

সুলতা বললে—তিনি তো বলেন নি!…কিন্তু একলা ততদূরে যেতে পারবে তো?

আমি বাস্তবিকই উদ্বিগ্ন হলাম। সুলতার ভরসাই এখন এই অতি অসহায় অবস্থার একমাত্র পুঁজি। সে যদি না যেতে চায়, তা হলে মনোসাধের গোড়ায় আগুন ধরাতে হবে। বললাম—আমি তোমার সঙ্গ ছাড়বো না প্রতিজ্ঞা করেছি, কিন্তু তুমি আমার সঙ্গ ছাড়বে কি না—সে প্রতিজ্ঞার কথা জিজ্ঞাসা করি নি। তোমার ভরসাই আমার সব চেয়ে বড় ছিল সুলতা!

সুলতা হেসে উঠলো। বললে—দিদির আমার জ্ঞান বুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেছে!—একলা মানেই তো আমি-তুমি দু'য়ে!… প্রতিজ্ঞার কথা তোমার মনে পড়ে না বুঝি?—কেন আমিই যে আগে প্রতিজ্ঞা করলাম ভাই!…দু'য়ের মধ্যে তফাৎ না থাক্‌লেই দুইকে লোকে বলে—এক। আমরা কি ভিন্ন সুপ্রিয়া?

আনন্দে সুলতার গলা জড়িয়ে ধরলাম। সুলতা চোখ নামিয়ে কাঁদতে বস্‌লো। সম্ভবতঃ এ সেই হাসির কান্না!

বললাম—একখানা টেলিগ্রাফ্‌ করবো। আমি লিখে ফেলি, তুই ততক্ষণ রণজিৎবাবুর খবরটা নিয়ে আয় সুলতা!

সুলতা চলে গেল। আমি লিখ্‌বার টেবিল থেকে একখানা ছোট কাগজ নিয়ে, রত্নাকরবাবুকে টেলিগ্রাফের কথা কয়টা লিখতে বস্‌লাম—বিকেলে ষ্টেশনে থাকবেন, আমি রওনা হলাম। তারপর পুরো নামটাই লিখতে হল।—আমি না হয় জল্পনা করে দিনরাত্রি তাঁর নাম জপ করছি। পুরুষ হয়ে তিনি যদি আজ আমাকে ভুলেও গিয়ে থাকেন, তো দোষী করার দুঃসাহস নেই।—সমাজ আর সংস্কার এই সভ্যতাই আমাদের শিখিয়ে আসচে।

সুলতা ও রণজিৎ ঘরে ঢুকলো।

আমি নমস্কার করে বললাম—ঘা খেয়ে খেয়ে ঘায়ের ব্যথা কারো বা গা-সহা হয়, কারো বা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। আমার কিন্তু গা-সহা হতে দেরী আছে। অথচ লক্ষ জ্বালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পাতাবার দুর্ভাগ্য আমি লাভ করেছি।...রত্নাকরবাবুর ঠিকানাটা লিখে দিন,—'তার' করবো।...কিন্তু ট্রেণের সময়টা কি কাল আমাকে বলেছিলেন রণজিৎবাবু? আমার তো মনে পড়ে না।

রণজিৎবাবু বললেন—রত্নাকর কাল যে সময় গেছে, আজ সেই সময় রওনা হয়ে পড়ুন। শুনেচি—এই গাড়ীখানায় গেলে অনেক সুবিধে আছে।...আর টেলিগ্রাফ্‌ করবেন কেন? ষ্টেশনে পৌঁছে, একটা তিন বছরের খোকাকে যদি বলেন—কল্‌গাঁর রায়-বাড়ীটা

কোন্ দিকে—তো সে-ই হাস্‌তে হাস্‌তে পথ দেখিয়ে দেবে।... কিন্তু আপনি তো যাবেন সুপ্রিয়া দেবী...কিন্তু...

ব্যস্ত এবং উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—সঙ্কোচকে আজ মান্য দেখাবেন না রণজিৎবাবু! তাহলে ঠকে ঠকেই আমাকে কেঁদে মরতে হবে। যেখানে যাবো ব'লে আয়োজন করছি,—সেখানে যাওয়ায় যদি কোন বাধা থাকে, আমায় খুলে বলুন! অনেক সয়ে এসেচি রণজিৎবাবু!—তাই লজ্জা-সরমের কাছে আমার বিদায় নেওয়া হয়ে গেছে।...রত্নাকরবাবুর অনুপস্থিতির বেদনা যদি আমাকেই সব চেয়ে বেশী বাজে জানেন, তা হলে তাঁর বন্ধু হয়ে, আপনি আজ আমাকে 'পর' বিবেচনা করলে, আত্মহত্যাই হবে আমার সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা। যা গোপন, যদি আমার সাম্‌নে তার প্রকাশ অন্যায় মনে হয়, তো সে গুপ্ত হয়েই থাকুক। আপনি খালি জানিয়ে দিন যে, মেদিনীপুর যাওয়া আমার উচিত নয়।

রণজিৎবাবু যেন অপ্রতিভের একশেষ হয়ে গেছেন! বললেন—লঘু কথাকে এত গুরু করে ধরলে—তার আর মীমাংসা চলে না। আমার তো অন্য উদ্দেশ্য নেই সুপ্রিয়া দেবী! আমি জান্‌তে চাচ্ছিলুম—রত্নাকরের কোন এক বিশিষ্ট আত্মীয়ের অসুখ, এসময় আপনি গিয়ে পড়লে, সে বেচারা বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়বে। যাঁকে অতিথিরূপে লাভ করলে, কোথায় রাখবে কি খাওয়াবে কেমন যত্ন করবে—এই চিন্তার আনন্দে অস্থির হতে হয়, আজ দারুণ বিপন্ন অবস্থায় তাঁর উপস্থিতিটা কি তাকে পীড়িত করে তুলবে না?... আপনার কি মনে হয়?

গর্দ্দানের ওপর খাঁড়া ঝুল্‌চে, তবু হাসির কথা শুনে, আমি হাস্‌তেই বাধ্য হলাম। বললাম—আপনার অনুমানকে প্রশংসা করচি রণজিৎবাবু! নইলে—একটু আগেই তো আমার মান বাড়িয়েছিলেন—সহস্র আত্মীয়-বন্ধুর মাঝখানেও রত্নাকরবাবুর অনুপস্থিতির বেদনা আমাকেই বেশী বাজবে! আর তাঁরই দারুণ বিপদে আমার উপস্থিতি শাস্ত্রসঙ্গত অনুচিত? কিন্তু এটা কোন্ শাস্ত্রের বিধি রণজিৎবাবু?

রণজিৎবাবু সহসা হাতযোড় করে বলে উঠলেন—অত্যন্ত অত্যাচারী যে, সে-ও ক্ষমার অমর্য্যাদা করে না, আমার অন্যায় অনুমানের যে অ পরাধ, তার মার্জ্জনা চাই সুপ্রিয়া দেবী!...আমার মনে পড়ে নি যে, আঁধার নষ্ট করবার অধিকার একমাত্র আলোকেরই এক-চেটে!—আপনি আঁধারের আলো! আপনিই হবেন তার বিপদে বন্ধু—সহায়!...আর তিন ঘন্টা পরে ট্রেণ আছে। এরই মধ্যে নাওয়া-খাওয়া শেষ করে ফেলুন।

এই সরলপ্রাণ ভদ্রলোকের অতিরিক্ত ভদ্রতায় আমি লজ্জিত হয়ে উঠ্‌লাম। ছি ছি! সরলতার কথা কি আজ সত্যসত্যই আমার কাছে বিদ্রূপের ঘোষণা এনে দেয়! সহসা মোহনলালকে মনে পড়ে গেল! —সে-ও অপটু ছিল না। কুটীলতার ভাব গোপন রেখে সরলতায় মুগ্ধ করবার দক্ষতা সে হয় তো বাড়ীতে মাষ্টার রেখে শিক্ষা করে-ছিল। কিন্তু অসতের চিন্তায় আমার মানসিক অবস্থার ভাবান্তর ঘটে গেল।—হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বস্‌লাম—আপনি মোহনবাবুকে জানেন?

রণজিৎবাবু একটুও বিস্ময়ের ভাব দেখালেন না। সরল ভাবে জবাব দিলেন—মোহনবাবুর নামও কানে শুনিনি সুপ্রিয়া দেবী! কিন্তু তাঁকে কি আপনার প্রয়োজন আছে? ঠিকানা বললে নিশ্চয়ই খোঁজ করতে পারবো।

আর্তস্বর চাপা রইলো না। বলে উঠলাম—না না, চাই না। এতটুকু প্রয়োজন নেই। আপনি আমাদের যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিন। এইটুকুই আজ সব চেয়ে বড় প্রয়োজন।

তারপর রণজিৎবাবু কিছু না বলতেই, আমি কলতলায় যাবার জন্য নীচে নেমে গেলাম। সুলতাকে যাবার সময় বললাম—তোরা গল্প কর ভাই!—আমি আসচি।

বেশীক্ষণ দেরী হয় নি, আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে দেখি—দুটিতে বেশ আলাপ জমে গেছে! বিষণ্ণ সুলতা প্রসন্ন হয়ে গল্প করছে!......

...রান্নার নামে আমার গায়ে জর আসছিল। এই রান্না-খাওয়ার তর্ক-বিতর্ক করতে করতেই মোহনবাবুর স্বরূপ চিন্‌তে পেরেছিলাম; এখন তার চিন্তাতেও আশঙ্কা এসে পড়ে।...

বাজারের খাবার খেয়েই পেট ভরাতে হ'ল। যাত্রার মিনিট দশ বারো পূর্ব্বে, সুলতা বললে—চলুন না রণজিৎবাবু!... আপনি থাকলে, রাস্তায় অন্য বিপদের ভয় থাকবে না।

রণজিৎবাবুর জবাব দেওয়ার আগে, আমি বল্‌লাম—এখনো তুই বিপদকে ডরিয়ে রইলি সুলতা? এক মোহনবাবু ছাড়া, সংসারে

এমন কেউ নেই—যে আমাদের কষ্ট ফেল্‌তে পারে।...এ কথা তো কাল থেকে জপাচ্ছি তোকে !

সুলতা বল্‌লে—তবু উনি পুরুষ মানুষ।

আমি বললাম—কিন্তু মেয়ে মানুষ কি—অমানুষ সুলতা ? সাহস আর শক্তি, এ দুটোর সঙ্গে কি তার কোনদিন সদ্ভাব থাক্‌বেনা ? ওরে ! সুলতা ! আজ আমাদের জয় করতে হবে ! কান্না-অশ্রু-ভয় এসব পুরুষ যে ভাবে গ্রহণ করে, আমরাও ঠিক তেমনি ভাবে গ্রহণ করবো। অশ্রু যদি সাথের সাথী হতে চায়, তার অপমান করবো না, কিন্তু ভয় যদি পেছু নেয়, তো শাসন করবার শক্তি খুঁজ্‌বো। আজ আমি মরিয়া হয়েচি সুলতা ! শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে তোকেও 'মরিয়া' হওয়ার কৌশল শিখিয়ে নেব।

সুলতা মৌন হয়ে রইলো। তার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা এক হচ্ছিল না ভেবে, আমি অভিমান করে বললাম—তবে এক কাজ কর ভাই ! তুই বরং দু'চার দিন রণজিৎবাবুর আশ্রয়েই থাক্, আমি ঘুরে এলে আবার ভবিষ্যৎ ভাবা যাবে।...রণজিৎবাবুর আশ্রয়ে রেখে, আমি তোর সম্বন্ধে বাস্তবিকই নিশ্চিন্ত থাক্‌বো।

রণজিৎবাবু বললেন—যদি সাহস দেন সুপ্রিয়াদেবী, তাহলে একটা কথা—

—বলুন না ! আপনাকে আমি অসময়ের বন্ধু ভাবি। তারপর অন্তরের কথাটাও অপ্রকাশ রাখলাম না। বললাম—রত্নাকরবাবু যাঁর হাতে যথা সর্ব্বস্বের ভার দিয়ে যান, তিনি আমার একটুও অনাত্মীয় হতে পারেন না।...মনুষ্যত্ব হারাবার দুর্ভাগ্য যদি না এসে

থাকে, তাহলে সত্যসত্যই আপনি আমার বন্ধু। বলুন—কি আপনার কথা ?

রণজিৎবাবু বললেন—রত্নাকরের সঙ্গে সাক্ষাতের যদি গূঢ় কারণ কিছু থাকে, তো আমায় খুলে বল্‌তে হবে। স্বাভাবিক যে কারণে আপনি তাঁর সাক্ষাৎ চান্, আমি সেকারণকেও অপ্রধান ভাবি নি, কিন্তু তা ছাড়া যদি আর কিছু থাকে......

আমি বললাম—কপাল সঙ্গে সঙ্গে ফেরে—একথা আমি বরাবরই বিশ্বাস করে আসচি।...আজও দুর্ভাগ্য হতে বঞ্চিত হ'লাম না।... যাঁর কাছে উপকার পেয়ে আমি প্রত্যেক দণ্ডে দণ্ডে নিজেকে ভাগ্যবতী ভেবে আসচি, আজ তাঁরই অসন্তুষ্টির বিধান করা, এ আমার চরম দুর্ভাগ্য—অমার্জ্জনীয় অপরাধ !...মার্জ্জনা করুন রণজিৎবাবু ! সকল কথা খুলে বলবার সময় আসে নি। বিশিষ্ট বন্ধুকেও আজ সে কথা বলবার মত সৌভাগ্যলাভে আমি বঞ্চিত হয়ে রয়েচি।

রণজিৎবাবু ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বললেন—কিন্তু আমি সে সৌভাগ্য লাভ করেছি সুপ্রিয়া দেবী !...সুলতাদেবীর মুখে......

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—শুনেচেন ?

রণজিৎবাবু মাথা হেঁট করে বললেন—সুলতাদেবীর অপরাধ এবং আমারও অপরাধ অবশ্য গুরুতরই,—কিন্তু তার কি মার্জ্জনা নেই সুপ্রিয়াদেবী ?...সমুদ্র-মন্থনে সুধাও উঠেছিল আবার গরলের ও অপ্রতুল ছিল না। যদি সুধাভ্রমে গরল খেয়ে থাকি, তো সে জ্বালা আমিই ভোগ করবো।...ছলনার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্ব জন্মের অপেক্ষা রাখে না সুপ্রিয়াদেবী ! এজন্মেই তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে।

কৌতূহল আর কর্ত্তব্য দুটোই যদি আজ অন্যায়ের সীমায় এসে থাকে, তো তারও সাজা নিতে আমি প্রস্তুত।...কিন্তু একের পাপে অন্যে যেন দণ্ড না পায়। সুলতাকে আমিই জুলুম করেছিলাম। নইলে হয়তো সে বলতো না।

আমি রাগ্‌বো না আহ্লাদ করবো? দীনতম অন্তরের গরীবানা, আর সন্দিগ্ধ বিশ্বাসহারা চাহনির গুপ্ত জ্বালা, আমার নিজস্ব হয়েই আমাকে পীড়া দিচ্ছিল, নতুবা রণজিৎবাবুর মত উদার ভদ্র ব্যক্তিকে আজ মনোবেদনা দেব কেন?...বল্‌তে চাইনি নয়, বলবার মত সাহস ছিল না।

বললাম—সময় সংক্ষিপ্ত।...আয়োজন ঠিক ঠাক্—আর কথা বাড়িয়ে লাভ হবে না। যা সুলতার মুখে শুনেচেন, তার একবিন্দু অতিরঞ্জিত নেই। আর জেনেচেন বলে, আমি রাগ করিনি, বরং আমার অক্ষমতাকে সুলতা মুক্তি দিয়েছে ভেবে খুসী হয়েচি। সমস্ত কথাই আমার আপন মুখে বলা উচিত ছিল। কিন্তু আপনি তো জানেন রণজিৎবাবু!—নারীর কোন্‌খানে সব চাইতে বড় ব্যথা লুকিয়ে থাকে?

রণজিৎবাবু ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে উঠলেন—আর তো সময় নেই, আপনারা বেরিয়ে আসুন। রাস্তাতেই গাড়ী ডেকে নেব।

সুলতা বললে—তাই চলুন। ষ্টেশন পর্য্যন্ত না গেলে, আমাদের গোলমাল হয়ে যাবে।

রণজিৎবাবু বললেন—ষ্টেশন পর্য্যন্ত নয় সুলতাদেবী, আমি শেষ পর্য্যন্তই যাবো।

দেখলাম—সুলতার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেচে! তাকে মলিন করতে আমার ব্যথা বাজছিল, কিন্তু শপথ-ভঙ্গকেই বেশী ডরাই আমি। প্রতিজ্ঞা করেছি—নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবো—অশ্রুর অপমান করবো—রোদনকে কাছে আসতে দেব না। বললাম—আর আমায় লজ্জিত করবেন না রণজিৎবাবু! অসহায়কে তার পথ খুঁজবার সাহস পেতে দিন।...পথের কাঁটা নিজের হাতে পরিষ্কার করতে পারলেই, তীর্থের পুণ্য অক্ষয় হয়ে থাকে। আপনি আর মিছিমিছি কষ্ট করবেন না।

সুলতা গম্ভীর হয়ে বললে—মেয়েমানুষের একগুঁয়েমী শোভা পায় না সুপ্রিয়া! এ অপরাধ।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম—মেয়েমানুষের যা শোভা পায় না, তা বুঝি পুরষকে শোভা-সম্পদে ভরপুর করে তোলে—কেমন? মেয়ে-মানুষের যা অপরাধ, পুরুষের বুঝি তাই পুণ্যের ছালা?...আমি এ বিধান মান্‌বো না সুলতা! আমি মেয়েমানুষের এ সমাজকে তুচ্ছ ভাববো—এই তো আমার সংকল্প!

সুলতা বললে—বেশ। তবে এক পা করে এগিয়ে চলো, আর এক রাশ করে বিপদ এসে পথ আগ্‌লে দাঁড়াক্।

হেসে বললাম—তাতে ভয় কি সুলতা? সুপ্রিয়া কি লড়াই করবার কৌশল জানে না ভাবিস? জয়-পরাজয় মেয়ে-পুরুষ দুদলের মধ্যেই আছে। হয়তো কারো কম, কারো বেশী। কিন্তু আছে,—থাকা উচিত সুলতা! ধনী ভাল খায়, ভাল পরে, গরীব মন্দ খায়, মন্দ পরে। কিন্তু ধনী-গরীব দুজনেই বেঁচে থাকে। মৃত্যুর পূর্ব্ব

পর্য্যন্ত তারা ভুলে যায় না যে, জগতে বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা যতটুকু, হয়তো আনন্দও ততটুকুই। পুরুষ চিরজয়ী—রাজরাজেশ্বর হয়ে থাকবে,আর রমনী হবে—তার দীন প্রজা—বাকী-খাজনার আসামী? সকল দিকের সকল আশায় বিমুখ?...

রণজিৎবাবুর মুখ দেখে মনে হল—তিনি আমার উপর কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হন নি। বরং তেজস্বীতার খাতির দেখাতে বললেন—লুপ্ত সাহস ফিরে আসুক,—আমরাও তাই চেয়ে আসচি সুপ্রিয়াদেবী! মনে রাখবেন—পথপ্রদর্শক যারা, তাদের পুরস্কার মানুষের চেয়ে ভগবানই বেশী দিয়ে থাকেন। আপনার উদ্যম আর শপথকে আমি মান্য দেখাচ্ছি। সুলতাকে সঙ্গে করে আপনি যাত্রা করুন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করে যান্—পৌঁছে সংবাদ দেবেন। আর রাস্তায় বিপদ বুঝলে আমাকে স্মরণ করবেন। যেখান থেকে যখনই খবর পাঠাবেন, আমি যাবার সময় এক সেকেণ্ডও পিছিয়ে দেব না।

স্বার্থ সিদ্ধ হলেই মানুষের অন্তর পুলকিত হয়ে ওঠে। আমি হেসে বললাম—তথাস্তু।

রণজিৎবাবুও হাসতে লাগলেন বটে, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম—তিনি মনঃক্ষুন্ন হয়েচেন। আর সুলতাও নিশ্চিন্ত হতে পারে নি।...সকলের মানসিক অবস্থা তো আর সমান হয় না। আমি যেমন মরিয়া হয়ে সংকল্পবদ্ধ হয়েচি, সে যদি তেমনি হতে না পারে, তবে দোষ দেওয়া চলে না। প্রচলিত প্রথায়, স্বাভাবিক নিয়ম আমি যতটা ক্ষুন্ন করেছি, সে ততটাই মানিয়ে নিয়েচে।

...লজ্জা বা দ্বিধা করলাম না। রণজিৎবাবুর হাত দিয়ে, রত্নাকর বাবুর দেরাজ থেকে একশোটাকা চেয়ে নিলাম।......

...ষ্টেশনে রওনা হ'লাম—ট্যাক্সিতে।

আধাআধি পথ চলে এসেচি, হঠাৎ সুলতার মুখপানে চেয়ে বিস্মিত হতে হল। সে যেন ফ্যাকাসে ম্লান! অনুভূতির সাড়া নেই তার, কৌতূহলের স্পৃহা নেই তাতে! জিজ্ঞাসা করলাম—মন খারাপ হল বুঝি? কিন্তু কেন?

সুলতা বিজ্ঞের মত হাসি হেসে বললে—অন্ধ জাগো, না কিবা রাত্রি কিবা দিন! ভাবা আর না ভাবা—তারতম্য কি আছে?

জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা সুলতা! আমার সকল কথা রণজিৎ-বাবুকে একটি একটি করে বলে দিলি, কিন্তু তোর কথা কি কিছুই বলবার ছিল না? এতটুকু বৈচিত্র্য ছিল না তাতে?

সুলতা বললে—যে নিজেকে হীন করতে পারে, তার হীনতা হয়—অন্যের ভূষণ। তোমার কথার আগে যদি আমার কথাগুলো জানানো সম্ভব হ'ত, তো তাই-ই আমি জানিয়ে দিতাম। তোমার সঙ্গসুখ পেয়েছিলাম বলেই না আজ আমি মুক্ত আলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে! ভাগ্যলিপির পরিবর্ত্তন করলে কে? সে তো তুমিই ভাই! কিন্তু সত্যিই কি আমার অন্যায় হ'ল সুপ্রিয়া?...রণজিৎবাবুকে আমি কেন যে ভদ্রলোক ভেবে নিলাম...

অভিমান দূর হল বটে, কিন্তু সুলতার উপর আমি বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লাম। আমি কি টের পাইনি যে, সুলতা কাল থেকে সমস্তক্ষণই রণজিৎবাবুর সঙ্গসুখ বাঞ্ছা করে এসেছিল? হয়তো উভয়ের মধ্যে

ভালবাসার বাতাস বইছে! আশ্চর্য্য নেই। বললাম—সুলতা! রণজিৎবাবুকে দোষ দিতে বা গালাগাল দিতে গিয়ে, নিজের মনকে প্রবঞ্চনা করো না ভাই! তা ছাড়া ভালকে মন্দ বললে ভালর কিছু ক্ষতি না হোক্ মন্দর মান বেড়ে যায়!...তোমার কাছে মিনতি জানাই, রণজিৎবাবুর এতটুকু কথার স্বর কাণে এলেই যেন মোহন বাবুকে আমাদের স্মরণ না হয়—এই সম্বন্ধে সতর্ক থেকো। রত্নাকরবাবুকে তুমি চোখে দেখ নি ভাই! কিন্তু রণজিৎবাবুর সঙ্গে আর তাঁর সঙ্গে আমি তফাৎ পেলাম না।...

...হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছে গেছি।

এইবার টিকিট কিন্‌তে হবে। সুলতার কথাকে আমি এতক্ষণে সম্মান দেখালাম। হঁ্যা, রণজিৎবাবু সঙ্গে এলে, এইক্ষুদ্র বিপদ হ'তেও অন্ততঃ মুক্তি পেতাম। কিন্তু বিপদ ক্ষুদ্রই হোক আর বৃহৎই হোক্, যখন আসে, তখন মানুষ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। সুলতার মুখখানা আষাঢ়ের মেঘলা সাঁঝের মত! চোখদুটো বৃষ্টিমাখা আধ-নিমীল কমলের মত!...বললাম—মনে রাখিস লতি! তুই ছাড়া আমার কেউ নেই, আমি ছাড়া তোরও কেউ নেই। এক দরিয়ার একপাশ দিয়েই আমাদের সাগরাভিযান! কূল যদি তুই পেয়ে থাকিস সুলতা! তা হলে, হয়তো আপন মঙ্গল ভেবে আমিই তোকে কূলহারা করলাম।...এতক্ষণে বুঝ্‌তে পারছি লতি! রণজিৎবাবুকে অন্ততঃ ষ্টেশনটুকুও আস্‌তে বলা উচিত ছিল। কোথায় কেমন করে যে কি করি!—ঘরে শুয়ে ভেবেছিলাম—দুনিয়া জয় করতে পারি, বাইরে দেখি—কুরুক্ষেত্রের সমর!...অসংখ্য ধূমধাম—আমাদের মত

তুচ্ছকে কে খেয়াল করবে! অয় দূরের কথা—এগিয়ে যাবার ভরসা নেই।

হঠাৎ সুলতা আনন্দে চীৎকার করে উঠ্‌লো—ঐ-ঐ ঐ দেখ্‌ সুপ্রিয়া! কে এলো দেখ্‌!

চেয়ে দেখি—আর একখানা ট্যাক্সি থেকে রণজিৎবাবু নামছেন। এতক্ষণে যেন ভরসা হচ্ছে—অদৃষ্টচক্র দুঃখের সীমানাকে উত্‌রে ফেলেচে। এইবার তার ঘোরার পালা সুখের রাজ্য দিয়ে! কিন্তু হা-রে সুখ! এ কপালে কি তার আমার মিলন হবে!

রণজিৎবাবু কাছাকাছি আস্‌তেই, উৎফুল্ল হয়ে বললাম—আসবো না বলে আবার যে চলে এলেন? থাকতে পারলেন না বুঝি?

কিন্তু রণজিৎবাবু এক কথাতেই আমাকে অপ্রতিভ করে তুল্‌লেন। বললেন—'আস্‌বোনা'—এই কথাটা যদি আমার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়তো, তাহলে ছুরী খানাকে এতক্ষণ এই মুখের রক্তেই রক্তাক্ত করে ফেল্‌তাম।...অন্তর চেয়েছিল,—দু-হাত দিয়ে আপনিই তাকে বাধা দিয়েছিলেন সুপ্রিয়াদেবী।

মাথা নত করে বললাম—মার্জ্জনা চাওয়ার সাহস আমার ক্রমেই বেড়ে চলেচে। মার্জ্জনা করুন রণজিৎবাবু! আমার অন্যায় হ'য়েছিল, বোকামী হয়েছিল। তারপর মনে মনে বললাম—মেয়ে মানুষ আর পুরুষমানুষের কৃতিত্ব এইখানেই বোঝা গেল হয়তো! সে ছুটে গিয়ে টিকিট কাটতে জানে, আর আমি কেমন করে ছুটবো তাই ভাব্‌তে জানি।

সহসা আমি ব্যস্ত হয়ে রণজিৎবাবুর দুখানা হাত চেপে ধরলাম।

তারপর মিনতি করে বললাম—ট্রেণের সময় হয়ে এলো।···আপনি টিকিট নিয়ে আসুন!...যা বলেছি ভুল বলেছি,—ভুলে যান, মাপ করুন।

রণজিৎ বাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বললেন—দেখচো সুলতা?—কালের কি রকম গতি? ভাল মানুষও পাগল হয়ে যায়।...

বুঝলাম—রণজিৎ বাবুর অন্তর সাদা ধবধবে,—সেখানে দাগ বসায় সাধ্য কার! বললাম—দুখানা নয় তিনখানা টিকিট আনবেন। আপনাকে না নিয়ে আমি যাবো না।

রণজিৎ বাবু তখন দ্রুত চলে যাচ্ছেন। আমার কথা শুনতে পেলেন কি না—বোঝা গেল না।

হঠাৎ সুলতা আমার মুখের কাছে মুখ এনে বললে—সুপ্রিয়া!

আমি হেসে বললাম—কেন রে?—এইবার মনের মত হ'ল তো?

সুলতা মুখ নামিয়ে নিলে।···

আমার কিন্তু শান্তি নেই। বিস্তীর্ণ জন-সমুদ্রের দিকে চোখ মেলে দেখতে লাগলাম—কোথায় আমার আপনজন!...এত লোক! কত আসচে কত যাচ্ছে! কত রোগী, কত অন্ধ, কত খঞ্জ রয়েচে—নাই শুধু আমার বাবা। ঈশ্বর আগুনের কুণ্ডমধ্যে আমায় বসিয়ে রেখেচেন আর যিনি রক্ষা করতে পারতেন, তাঁকেই কোন্ অজানা ঘুমন্ত রাজ্যের সীমান্তে পাঠিয়ে দিয়েচেন!···এই গুণেই লোকে তাঁকে সুবিচারক বলে!...জগত শাসন করতে হলে এমনি সুবিচারই তো চাই!

পাশ দিয়ে দুজন ভদ্রলোক চলে গেল—একজনের হাতে ব্যাগ, বগলে ছাতা; আর একজনের কাঁধে পুটলি হাতে লাঠি। একটা মেমসাহেব চলে গেল—হাতে একখানা ছোট্ট কাগজের পাখা! তারপর সম্ভবতঃ কোনো এক রাজা-মহারাজার দল! পাঁচ দশজন চাকর-দরোয়ান্-মোসাহেব সঙ্গে রয়েচে। ঠিক তার পেছনে পেছনে এক অন্ধ,—যষ্টী ধরে এক কিশোর; দুজনেই মুসলমান! আহা! অভিশপ্ত বেচারী! মানুষই হয় পৃথিবীশ্বর, আবার মানুষই ফেরে দোরে দোরে ভিক্ষায়। অন্ধ বেচারীর মাথা পর্য্যন্ত কাপড় জড়ানো। ডান হাতখানার অর্দ্ধেকটুকু ময়লা ন্যাকড়া দিয়ে বাঁধা। বাঁ হাত ভিক্ষার আশায় বাড়িয়ে রেখেচে। কিশোরটিরও দেহ সুস্থ দেখলাম না, অন্ধের যষ্টী বটে সে, কিন্তু কাণা হওয়ার নোটীশ পেয়ে গেছে। বাঁ চোখটায় সবুজ রঙের একটুকরো মোটা কাগজ ঝুলচে। কপাল থেকে মাথার চারধার ও বাঁ চোখ ব্যাণ্ডেজ দিয়ে জড়ানো। দেখলাম—পাঁচ সাতশো লোকের মধ্যে দয়ার্দ্র যারা, তাদের অন্তর সিক্ত হয়ে উঠেচে। অন্ধ চায় নি, শুধু হাত পেতে রয়েচে, তবু ভিক্ষার ঝুলি তার ভরপুর!… ঈশ্বরের নির্ম্মম কারুণ্য!

রণজিৎবাবু টিকিট নিয়ে এসে, সুলতার সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি অন্ধ-কানার মমতায় পড়ে ততটা খেয়াল করি নি। নির্ণিমেষে হতভাগ্য ভিখিরীদের দেখছিলাম!…কিশোর চীৎকার করে উঠলো—আর পারি না রাজা বাবা!…দয়া কর…প্রাণ আর বাঁচে না মা ঠাকরুণ!…প্রাণ গলানো কথা বটে!—ভিক্ষুক-কণ্ঠের তীব্র বেদনা—আজ এরা যেন নতুন বুলিতে আওড়ে যাচ্ছে। এক

কথাতেই মর্ম্ম স্পর্শ করে।···গরীবের হাতটাও উস্‌খুস্‌ করছিল, দূরে চলে গেছে,—নতুবা টাকাখানেকই আজ দিয়ে দিতাম।

হঠাৎ সুলতা আমার পিঠে ধাক্কা দিয়ে বলে উঠলো—হাঁ করে কি দেখচো দিদি? এই ট্রেণেই যাবে তো? না ফিরতে হবে?··· পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা পড়ে গেল যে!

দেখলাম—রণজিৎবাবুও আমার পানে চেয়ে হাসচেন।

বললাম—চলুন! আপনারা স্বাধীন—যখন যেখানে খুসী ঘুরে বেড়ান। পরাধীনের নজর সীমাবদ্ধ সাধও সীমাবদ্ধ। আজ কত কাল পরে হাওড়া ষ্টেশনে এল্লাম! চেয়ে চেয়েই আশ মেটে না!··· কিন্তু আপনার আবার দুটো ব্যাগ কেন? অনেক দিন থাকবেন বুঝি?

গাড়ীর কাছে এগিয়ে যেতে যেতে রণজিৎবাবু বললেন—আমাকে তো আপনি নিয়ে যাবেন না সুপ্রিয়া দেবী!

আমি হেসে বললাম—মানুষ অভিমান করে যার ওপর, সে-ই হয় তার নিকট আত্মীয়। আজ আমাকে ধন্য করলেন রণজিৎবাবু! কিন্তু আপনাকে না নিয়ে যে আমাদের যাওয়াই হবে না।···কি-রে সুলতা! যাবি—রণজিৎবাবুকে ছেড়ে?

সুলতা বললে—তুমি যা পারবে আমাকেও তাই পারতে হবে ভাই,—অন্ততঃ চেষ্টা করেও দেখতে হবে।

একখানা সেকেণ্ডক্লাস কামরার সুমুখে এসে রণজিৎবাবু বললেন—ভালই হ'ল—দোসরা আদ্‌মি নেই।...উঠে পড়ুন!

বিস্মিত হয়ে বললাম—করলেন কি রণজিৎবাবু? এ যে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যবস্থা! এত খরচ করা আমাদের উচিত হল?

রণজিৎবাবু আগেই গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। তারপর বললেন—আগে উঠে পড়ুন।—ভৎর্সনা করবার সময় অনেক পাবেন। তারপর পকেট থেকে একখানা টেলিগ্রাফ বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন—এরই জন্যে ছুটে আসতে হল। নইলে রণজিতের অভিমান এক কথাতেই ভেঙে যেত না।

টেলিগ্রাফ পড়ে দেখি—রত্নাকরবাবুর বিশিষ্ট আত্মীয়টির মৃত্যু হয়েচে। এবং রণজিৎবাবুকে তিনি অবিলম্বে যেতে লিখেচেন।

গম্ভীর হয়ে আমি বেঞ্চে বসে পড়লাম। প্লাটফর্ম্মের দিকে চেয়ে দেখি—সেই অন্ধ আর তার কিশোর সহায়টি, আমাদের কামরার প্রায় পাঁচ ছখানা আগের কামরায় উঠ্‌চে।

বুকের মধ্যে আমার ঝড় উঠেচে। বিভীষিকার মাতন সারা অন্তরকে মুস্‌ড়ে দিচ্ছে! ভাবনার আর আদি অন্ত নেই।…যেখানে চলেছি, সেখানে যাওয়ার অধিকার আমার কতটুকু!…এতক্ষণে হিসাব নিকাস করবার সময় হল!

সুলতা আর রণজিতের গল্প চলেছে। যোগ দিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু পারি না!—বলবার শক্তি কে যেন কণ্ঠ থেকে হরণ করে নিয়েছে।

ট্রেণ তখন দ্রুত গতিতে। জান্‌লার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দেখি—রণজিৎবাবু তাঁর ব্যাগ খুলে, ছোট একটি ক্যামেরা বের করেছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—চলন্ত গাড়ীথেকেও কি ফটো নেওয়া চলে রণজিৎবাবু!

রণজিৎবাবু বললেন—চলে। দেখুন না—কত বন-জঙ্গল-নদী-খাল-বিলকে আজ ধরে নিই।...যখনই বাইরে যাই, এ ক্যামেরা আমার সঙ্গী হয়।

অনেকক্ষণ থেকেই দারুণ আশঙ্কা আর সন্দেহ আমাকে পীড়া দিচ্ছিল। বললাম—আমার একটা অনুরোধ আছে রণজিৎবাবু!... কিন্তু ট্রেণ খানা কতক্ষণ পরে বড় ষ্টেশনে থাম্‌বে জানেন?

রণজিৎবাবু বললেন—আধ ঘণ্টা পরে।

আমি বললাম—সেই যে ভিখিরী দুটো, দেখেছেন্‌ তাদের?

—হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলুন তো? তাদের ফটো চাই নাকি?

—আপনার অনুমান ঠিক।

রণজিৎবাবু ক্যামেরাটা বেশ করে গুছিয়ে নিয়ে, বললেন—ভাল কথা, সব আগে আপনার হুকুমটাই তামিল করছি।...কিন্তু হঠাৎ এই ভিখিরীর ছবির ওপর এত দরদ কেন সুপ্রিয়া দেবী?...ছবি আঁকার হাত আসে নাকি? মডেল করবেন?

ঈষৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। রণজিৎবাবুর কথা ভাল শুনতে পাইনি। ইতি মধ্যে একটা ছোট ষ্টেশনে ট্রেণ থামলো। চেয়ে দেখি, একজন 'ক্রু' আমার সেই সাধের ভিখিরী দুটীকে প্লাট-ফর্মে নামিয়ে দিলে।...

অম্‌নি সঙ্গে সঙ্গে রণজিৎবাবু প্রস্তুত হয়ে, বললেন—থ্যাঙ্ক গড্‌!

ঘোরাঘুরির কষ্ট পেতে হল না। বলতে বলতেই তাঁর ছবি তোলা শেষ হয়ে গেল।

মনের মধ্যে আমার অনেক প্রকার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলছিল। গাড়ী ছাড়বো ছাড়বো করছে,—'ক্রু' ভদ্রলোককে ডেকে বললাম—ওদের যেতে দিন। ভাড়া আমি দিচ্ছি।

'ক্রু', ভিখিরীদের গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়েই আমাদের কামরায় ঢুকে পড়লো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ওরা কোথায় যাবে?

বাবুটি অপ্রস্তুত হয়ে বললে—মাপ করুন,—আমি জিজ্ঞেস করে আসচি। পনের মিনিট পরে গাড়ী থামবে, তারপরই আপনাকে সব কথা জানিয়ে যাবো।

আমি বললাম—লক্ষ্য রাখবেন। কোন্ গাড়ীতে উঠেচে—ঠিক আছে তো? ভিখিরীগুলোকে আমার বিশ্বাস হয় না। যদি পালায়, তাহলে আমাকেই যেন দোষী হতে না হয়।

'ক্রু হাসলো। বললে—আপনি দোষী কেন? সে দোষ তো আমাদেরই'—তাছাড়া যে গাড়ীতে তুলে দিয়েছি, সেখানে ঐ দুজন ছাড়া জনপ্রাণী নেই। ছোট্ট একটা লেডিস্ কম্পার্টমেণ্ট।

আমি বললুম—তবু লক্ষ্য রাখবেন। ভিক্ষা করার কৌশল—আর চুরি করবার কৌশল-দুই-ই ওদের দুরস্ত হয়ে থাকে।

রণজিৎবাবু তখন অনবরতই ছবি তুলছেন। সুলতা একদৃষ্টে চেয়ে দেখচে।

ক্রু বললে—তবু আপনি ঐ চোর ডাকাতদের টিকিট কিনে দেবেন? ফাইন্ দিয়ে খালাস করবেন?

আমি বললাম—হয়তো ভাল মানুষ ওরা,—কিম্বা বদ্মায়েস। তবু সাবধান হ'তে দোষ কি?...তারপর মনে মনে বললাম—জাতির অপমান জাতিই ডেকে নিয়ে আসে।...অভাবীকে বঞ্চিত করতে হলে, অনেক ধনীবাবুরও মাথার ঘামে পা ভিজে যায়।

গাড়ী থাম্লো। ক্রু বাবুটিও তাড়াতাড়ি নেমে গেল। আমরা তিনজন কৌতূহলী হয়ে মুখ বাড়ালাম।

কিন্তু মজার ব্যাপার বটে! দেখি—'ক্রু' মশায় খালি পায়চারী করছেন! প্লাটফর্ম্মের এ মোড় থেকে ও মোড় পর্য্যন্ত বারদুই ঘুরে আমাদের সাম্নে এসে বললে—ব্যাটারা ভেগেচে।...কিন্তু গাড়ী থাম্তেই তো নামলাম, পালালো কখন?

রণজিৎবাবু চট করে প্লাটফর্ম্মের বিপরীত দিকে নেমে পড়েই চেঁচিয়ে উঠ্লেন—এখানে গাড়ী কতক্ষণ থাকবে?

'ক্রু' জবাব দিলে—দশ মিনিট।

রণজিৎবাবু আর কথা কইলেন না। সাম্নে যে ছোট্ট জঙ্গল ছিল,—তার মধ্যে ঢুকে গেলেন।

আমি চিন্তিত হয়ে উঠ্লাম। সর্ব্বনাশীর সঙ্গ নিয়ে হয়তো রণজিৎবাবুরও সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। যারা অন্ধ সেজে বসে থাক্তে থাক্তে এক মিনিটে গা ঢাকা দেয়, নিঃসহায় পেয়ে তারা খুন করবারও বদ্ মতলব রাখে!

আমি ও স্থলতা প্লাটফর্ম্মে নামলাম। 'ক্রু'র দলকে দলই তখন

আমাদের সঙ্গে। ষ্টেসন মাষ্টারও জুটে গেছেন। বেশী লোকের সামনে দাঁড়ানো সুলতার অভ্যাস ছিল না। আমি অভ্যস্ত না হলেও, নিতান্ত অনভ্যস্ত নই। সুলতাকে গাড়ীর মধ্যে যেতে বলে, আগের সেই 'ক্রু'বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—কোন্ গাড়ীতে ছিল ?

ক্রু খানিকটুকু এগিয়ে এসে যে কামরা দেখালে, সেখানা থার্ড ক্লাস, তার মধ্যে দুজন কাবুলী বসে রয়েচে।

'ক্রু' বললে—ওদের কাছে কোন খবর পাই নি। ওরা এইমাত্র ঢুকেচে।

রণজিৎবাবুও তখন জঙ্গল ঢুঁড়ে ফিরে এসেচেন।

আমি বললাম—শীগ্গীর যান! ক্যামেরা নিয়ে আসুন! ঐ দু ব্যাটার ছবি তুল্‌তে হবে।

রণজিৎবাবুর উৎসাহ বেড়ে গেল।...পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাবুলেওয়ালার ছবি তোলা হল।

ক্রুর সর্দ্দার যে,—সে জিজ্ঞাসা করলে—এর মানে কি মশায় ?

জবাব দিলাম—আমি, বললাম—মানে আমরাও ভাল জানি না। ছবি তোলার সখ্ আছে, তুলে নিলাম। কিন্তু আপনারা সাবধান মশায়! এই ট্রেণ খানায় যে কোনো কামরায় ডাকাত আছে। বিলিতী দস্যু!—সব করতে পারে।

সুলতা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আমার পানে চাইতে লাগলো। তাকে বললাম—কি রে অবাক্ হয়ে গেলি যে! তারপর খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বললাম—ছোট কাবুলে-সাহেবকে চিন্‌তে পারিস্ ?—আমাদের কেষ্ট রতন।

একটা অস্ফুট চীৎকার করে সুলতা দু তিন পা পিছিয়ে দাঁড়ালো।

আমি 'ক্রু'দের একজনকে বললাম—আপনারা দয়া করে ঐ খাঁ সাহেবদের পুঁটুলিটা কেড়ে নিয়ে আসুন। কিন্তু ওদের কামরায় কেউ থাকবেন না, অথচ সতর্ক হয়ে পাহারা দেবেন। যেন না পালায়।

আমার কথা মতই কাজ করা হল। সকলে যে যার জায়গায় ফিরে এলে, ট্রেণ ছাড়লো।

রণজিৎবাবু বললেন—এত বড় প্রকাণ্ড ট্রেণের সমস্ত লোক গুলোকে 'যে-আজ্ঞের' চাকর বানিয়ে দিলেন, অথচ একজনও জান্‌তে চাইলে না যে, এই হুকুম দেওয়ার কারণ কি! বাহাদুরী আছে সুপ্রিয়া দেবী! কিন্তু সুলতা! পারো তুমি?

সুলতা মৃদু হেসে বললে—আমি তো মেয়ে মানুষ,—আপনি পারেন?

রণজিৎবাবু জবাব দিলেন—আমি যখন হুকুমের চাকর সেজেচি, তখন না-পারার দলে।

সুলতা বললে—আমি কিন্তু ঢের আগেই ও পদটা দখল করে রেখেচি।......

...পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামলো।

ক্রুদের একজন এসে বললে—'আগা সাহেবরা' সমঝে গেছেন। কিন্তু এই পুঁটলীটার মাল পত্র গুলো আপনাদের সুমুখেই খুলতে

হবে। যদি দরকার হয়, আমার কৈফিয়ৎ তলব হলে সাহায্য করবেন।

পুঁটলি খোলার জন্য সবাই মিলে আমাদের ঘরেই ঢুকে গেল। গাড়ী তখন চলতে স্বরু করেছে।

কিন্তু আজ আমি আমাকেই বাহাদুরী দিয়ে বস্‌লাম। যা অনু-মান করেছিলাম—অবিকল মিলে গেছে। পুঁটলির মধ্যে ভিখিরীর সাজ ভাঁজ করে রাখা হয়েচে। মায় গোঁফ দাড়ি এমন কি কেষ্ট রতন চোখে যে সবুজ রঙের পটী বেঁধেছিল—তা-ও! কিন্তু সন্দেহকে নিশ্চয় করবার লোভ আমি কোন মতেই সাম্‌লে রাখতে পারবো না। আমাকে দেখতেই হবে—বড় কত্তাটি মোহনবাবু কি না!......

...পরের ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌লো।

'ক্রু' বাবুরা খবর দিলে—আর এক নতুন ব্যাপার! বড় চোরটা সরে পড়েচে. ছোট কত্তা বসে বসে কান্না জুড়েছেন।... আচ্ছা, ব্যাপারটা ভেল্কী দেখাচ্চে না তো?

রণজিৎবাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—ভেল্কী বলে ভেল্কী, শেষ পর্য্যন্ত আপনারা নিজের হাত পা গুলোই খুঁজে পাবেন না।...আরে মশায়! এ কি ভূতের দেশ পেয়েছেন? গাড়ীখানা সমস্ত পথ পাহারা দিয়ে এলেন, অথচ চোখের ওপর আসামী পালালো—দেখতে পেলেন না?

'ক্রু' বাবুটি অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে গেল। মাথা হেঁট করে বললে—কি করবো মশায়! দেখছেন তো—আমাদের কি চেষ্টার

ক্রুটী আছে? ছোট ছোঁড়া কাঁদতে কাঁদতে বললে—চলন্ত গাড়ী থেকেই ব্যাটা লাফিয়ে পড়েছে। এর কি উপায় বলুন?

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। কি সর্ব্বনাশ! চলন্ত ট্রেণ থেকে লাফ দিয়ে পড়লো! জীবনের মায়ায় যে বেঁচে থাকার উপায় খুজতে লক্ষ কোটী পাপ অঙ্গের ভূষণ করে রেখেছিল, আজ সেই পিশাচ মোহনবাবু জীবনে মমতা রাখলে না!

আমি যে কি বলবো কিছু ঠিক করতে পারি নি। রণজিৎবাবু বললেন—গাড়ীখানায় আপনাদের দলের অন্ততঃ জন চার পাঁচ হাজির থাকুন। আর ষ্টেশন থেকে দুজন রেলওয়ে পুলিশ সঙ্গে নিন। বলেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু এরা যে কি দোষে দোষী, তার প্রমাণ সমেত আপনি কৈফিয়ৎ দিতে পারবেন তো?

সোৎসাহে আমি বললাম—নিশ্চয়ই পারবো। আমি একা নই, সুলতাও পারবে। তারপর 'ক্রু' বাবুকে বললাম—সাবধান বাবু! ছোট ছোঁড়ার ওপর কড়া নজর রাখবেন। ছোট হলেও প্রকাণ্ড ডাকাত সে! দিনকে রাত্তির বানাতে পরে।

বুক খানায় ঝড় উঠেচে! বাবাকে মনে পড়লো।...সরল প্রাণের এই তো পুরস্কার! মোহন বাবুর কথায় কেষ্টকে তিনি বাড়ীতে এনেছিলেন, কেষ্ট যা পুরস্কার দিয়েছে, মোহন বাবু তার লক্ষ গুণ বেশী দিয়েছে। চুপ করে কেউ থাকে নি। যে লোক শত্রুতার জাল পেতে ধরা পড়তে বসেচে, সেই লোকের জন্যই বাবা আমার চিন্তার বিরাম দেন নি। আসবে না সে, চলে গেছে, আমি জানছি সর্ব্বনাশ করবার পর শত্রু গা ঢাকা দেবে! কিন্তু

বাবা সেই পাপাত্মার জন্যই আমাকে বারে বারে আদেশ করেছেন—'আসতে দেরী হচ্চে' মোহনের জন্যও চারটি চাল নিস্ মা!'

কিন্তু কাঁদবার সময় হয়তো ভবিষ্যতে ঢের পাবো। যে আমার বাবাকে প্রতারণা করে পালালো, আমার পুরোপুরি সর্ব্বনাশের জন্য হীন পন্থা ধরতেও কসুর রাখলে না, যার জন্য আমি এত বড় ব্রহ্মাণ্ডে আজ একাকিনী, সেই মোহনবাবুর খোঁজ যখন পেয়েছি, তখন শোক প্রকাশ করে সকল দিক্ মাটি করবো না।

কিন্তু সেই পলাতক চোরটা যদি মোহনবাবু না হয়ে অন্য কেউ হয়! নাঃ মগজটা গোলমাল হয়ে আসচে। এতক্ষণে অদৃষ্ট মানবার সুযোগ পাচ্চি।

অন্য কোন ষ্টেশনে আর নামিনি বা কোন খোঁজ নিতেও চাই নি। যে ষ্টেশনে আমরা নামবো. সেখানে গাড়ী থাম্‌তেই, জিনিস পত্র গুছিয়ে নিলাম এবং তিনজনেই নেমে পড়লাম।

ক্রুর দল এবং রেলওয়ে-পুলিশ মারতে মারতে শ্রীমান কেষ্ট গোপালকে ধরে নিয়ে এলো। আহা মরি মরি! ভায়াজীবন আমার কী সাজই সেজেচেন! যেন স্বয়ং আমীর বাহাদুর! খাজা কাবুলদেশের মেওয়া খেকো চেহারা! চেনে কার সাধ্যি!

রণজিৎবাবু তার মাথার টুপি এবং গায়ের অন্য পোষাক টেনে খুলে ফেললেন।

সুলতা জিজ্ঞাসা করলে—কি রে কেষ্টরতন! হাওড়ায় যে চোখে ঠুলি বেঁধে ভিক্ষে করছিলি, এর মধ্যে চোখ ভাল হয়ে গেছে?

কেষ্ট তখন অসাধারণ গম্ভীর। তার চাহনি দেখে, আমার স্থির

ধারণা হ'ল—নিশ্চয়ই সে পালাবার পথ খুঁজচে; বললাম—রণজিৎ বাবু সাবধান! ছোট কত্তাও সরে পড়বার মতলব আঁটচে।

ট্রেণ চলে গেল।

পলাতক আসামী, যাকে মোহন বাবু ব'লেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, তাকে পাওয়া গেল না।

রেলওয়ে পুলিশ ও ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে রত্নাকরবাবুর বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে আমরা যাত্রার আয়োজন করলাম। কেষ্টচন্দর আবার পুলিশের হাতে পড়লো।

কিন্তু মিথ্যা ছলনার মায়ায় ভুল্‌বো না বলে মনে মনে আমি যা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আসবার সময় কেষ্টর কান্না দেখে সে প্রতিজ্ঞা শিথিল হচ্ছিল। আহা! ছেলে মানুষ! কচি মাথার ঘিটুকু, তার মোহনবাবুই চুষে খেয়েচে। নইলে ভাল থাকলে সে তো আজ এমন অবস্থায় দাঁড়াতো না।

কিন্তু আমার বিস্ময়টা অত্যন্ত বেশী হয়েছিল এই ভেবে যে, যাকে আমরা নিজে থানায় হাজির হয়ে পুলিশের হাতে দিয়ে এসেছিলাম, সে ছাড়া পেলে কি করে!

বিস্ময়টা কেষ্টই ভেঙে দিলে!—কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আপনা আপনি সে বলে ফেললে—মোহনবাবু স্বয়ং থানায় হাজির হয়ে, কলকাতার খুব বড় একজন উকীলবাবুর নামের চিঠি দেখিয়ে কেষ্টর জামিন হয়েছিল। তারপর আরও বিস্ময়ের ব্যাপার—আমি ও সুলতা যে তার গারদখানা থেকে পালিয়ে এসেছিলাম—সে তা গোড়া থেকেই জান্‌তো। এমন কি আমাদের মেদিনীপুর আসার সন্ধানও সে তলে তলে জেনে নিয়ে-

ছিল।...তা হলে ভিখিরী এবং কাবুলের বেশ—মোহন বাবুরই ছদ্মবেশ।...

যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছি,—গাড়ী ছাড়তে দেরী, কেষ্টর মুখে এই সব ভয়ানক ঘটনা শুনে, আমি তখনি চলে আসতে পারলাম না।—মোহনবাবু আমাদের অনুসরণ করতে এলো কেন? বাবাকে হয় তো দুনিয়া থেকে সরিয়েছে—মোহনবাবুই! আমার সর্ব্বনাশ করবার যে কুটীল চক্রান্ত এবং আয়োজন করেছিল তাতেও কৃতকার্য্য হয় নি, টাকা পয়সা তা-ও আর কিছু নেই আমার! তবে কেন? কি তার উদ্দেশ্য ছিল।

কেষ্টকে জিজ্ঞাসা করলাম—আমদের পেছনে পেছনে, এমন ছদ্ম-বেশে তোরা কেন এসেছিলি?

কেষ্ট কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বললে—যখন একবার ছাড়া পেয়েও আমার পুলিশের হাতে পড়েছি, তখন আর বাঁচবো না দিদিমণি! মোহনবাবুই আমাকে খেলে। তার কাজ ছিল—ভাল সেজে লোকের মন্দ করা। লোক ঠকিয়ে এবং লোকের সর্ব্বনাশ করে—সে যে কত পয়সা উপায় করেছে—তার হিসেব আমি জানিনে—সেও হয়তো জানে না। কিন্তু একপয়সাও হাতে রাখ্‌তে পারেনি। যাত্রার দলে চাকরী করতাম, সেখান থেকে আমায় ধরে এনে, এমন কোনো বদ্‌কাজ নেই, যা সে আমাকে দিয়ে করায়নি।...কিন্তু তার জোচ্চুরীর নাগাল পেতে এখনো আমার ঢের বাকী ছিল।...তোমাদের সর্ব্বনাশ করেছি—কিন্তু আমার মাসীর ব্যারাম হওয়ার ছুতো করে, টাকা নিয়ে পালানো—তারপর বাবু, তোমার বাবাকে লুকিয়ে রাখা—

আমি ব্যগ্রকণ্ঠে বলে উঠ্‌লাম—কিচ্ছু জান্‌তে চাইবোনা কেষ্ট! আমি এই ভদ্রলোকদের পায়ে প'ড়ে তোকে ছাড়িয়ে নেব,—আজ সত্যি কথা বল্‌ ভাই!—বল্‌—আমার বাবাকে সে কোথায় রেখেচে? কেমন আছেন তিনি? কোথায় গেলে আমি বাবার দেখা পাবো?

কেষ্ট হঠাৎ কোন জবাব দিতে চাইলে না। কেবল সকলকার পানে চেয়ে চেয়ে চোখ্‌ মুছতে লাগ্‌লো।

আমি বললাম—ভয় নেই কেষ্ট! সত্যি কথা বল্‌! আমি যেমন করে পারি তোকে ছাড়িয়ে নেব।

কেষ্ট বললে—বড্ড ভয় হচ্ছে দিদিমণি! আগে ছাড়িয়ে নাও! তোমরা যেখানে যাচ্ছো, তোমাদের সঙ্গেই আমাকে নিয়ে চলো। পথে যেতে যেতে সব কথা তোমায় খুলে বলবো।

আমি সহসা কোন উপায় ঠিক করতে পারছিলাম না। রণজিৎবাবু আমার কানে কানে বললেন—ওয়েটিংরুমে নিয়ে গিয়ে, আপনি একা ওর সঙ্গে কথা বলুন। হয়তো বলতে পারে।

সেই ব্যবস্থাই মনে লাগলো। ওয়েটিংরুমে কেষ্টকে নিয়ে এসে, তাকে খুব আদর করে বললাম—কেষ্ট! ভাই! আমি তোর মার পেটের বোন। তুই আমার ভাই! দিদি কখনো ভাইকে পুলিশের হাতে দিতে পারে? নির্ভাবনায় সব কথা খুলে বল্‌! তোর গা ছুঁয়ে দিব্যি করচি,—সঙ্গে করেই তোকে আমি নিয়ে যাবো। কিচ্ছু ভয় নেই—বল্‌!

দুষ্ট বুদ্ধির অভিনয় করে করে হতভাগার কিছুই জান্‌তে বাকী নেই। নিজেকে বাঁচাবার উপায় সে এমনভাবে ঠিক করে নিলে,—

যার জন্য আমি প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না। বললে—আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করেছো ? কিন্তু যে তোমার সোণার সংসার ছারখার করে দিলে,—তার গা ছুঁয়ে দিব্যিকে আমি মান্‌বোনা দিদিমণি ! যদি তোমার বাবার নামে দিব্যি করতে পারো—

—ওরে তাই-তাই ! তাই করছি কেষ্ট ! আমার বাবার নামেই দিব্যি করলাম—বল্‌ ! কোথায় আমার বাবা ?

কেষ্ট ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলো ! ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আমার মুখপানে চাইতে লাগলো।

অধৈর্য্য হয়ে বললাম—তোর পায়ে পড়ি দাদা ! বল্‌ ! ওরে এখনো কি তুই আমাকে অবিশ্বাস করে থাকবি কেষ্ট !...তোকে যে আমি সত্যি সত্যিই বড় স্নেহ করতাম কেষ্ট ! বল্‌...

কেষ্ট মাথা নীচু করে বলবার জন্য তার গলাটাকে বেশ করে ঝেড়ে নিচ্ছিল।

ওঃ—আমার মনে হচ্ছে—এই অভাগী সুপ্রিয়ার টুটি কাট্‌বার জন্যই বুঝি কেষ্ট আজ ছুরীতে শান্‌ দিতে বসেচে !

কেষ্টকে আর বলবার জন্য তাড়া দিতে পারলাম না, যদি সে... উঃ—না না তাকি হতে পারে ! বাবা আমার নেই !...কেষ্টকে যে আমি 'ভাই' বলে সম্বোধন করেছি ! সেকি এমনি নিষ্ঠুর কথা আমায় শোনাতে পারে !

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে মাথা নীচু করলাম।

—ঠিক তখনি আমার মাথায় আর বুকে বজ্রপাত হয়ে গেল !

—কেষ্ট বললে—কর্ত্তাবাবু নেই দিদি !...

সবলে কেষ্টার মাথাটা আপন কোলের মধ্যে চেপে ধরে, আমি বললাম—টিপে মারবো—তোকে! শূয়ার! বল্—কেন নেই? কেন আমার বাবা বেঁচে নেই? কি হল তাঁর?

কেষ্ট আমার হাতের চাপে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। বল্লে—যেদিন রাত্রিতে গাড়ী করে তোমায় নিয়ে আসি,—সেই দিনই মোহনবাবু গুণ্ডা দিয়ে তাঁকে মেরে ফেলেচে!...মাথাটা কেটে ফেলে, বেলেঘাটার রেল-লাইনে—

কেষ্টকে এমন এক ধাক্কা দিলাম—ছিটকে সে তিনহাত তফাতে পড়ে গেল। ক্রন্দন আমার অন্তরে লুকোলো! অশ্রু আমার নয়ন ছেড়ে উধাও! বুক ধসে ভেঙে, টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাচ্ছে!—আমার বাবা নাই! পঙ্গু, অশক্ত, নিষ্পাপ মহাপ্রাণ জগতের কোন্ সে' এক অতি নগণ্য ঠাঁইটুকু আশ্রয় করে পড়ে ছিল,—সংসারের তা-ও সহ্য হ'ল না! প্রাণ দিয়ে যাকে নিরাপদ রাখতে চেয়েছিলেন, আজ বাবা আমার তারই হাতে প্রাণ সমর্পণ করলেন!...এতবড় অসীম নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে এতটুকু ঠাঁই তাঁর পাওনা ছিল না! ওগো বিধাতা! আজ তোমায় কি বলে মনোবেদনা জানাবো? জানাবার মুখ আজ তুমিই যে বন্ধ করে দিয়েছ! নির্ম্মম ব'লতে যে তোমাকে সাধ হয় না! তুমি যদি নির্ম্মম হতে—এই তপন-চন্দ্র-তারার দলকে চালাতো কে? শৃঙ্খলার পথেই যে কত মহা মহা বিঘ্ন এসে পড়তো? কিন্তু কি বলবো তবে? কি তোমার নাম? এমন যার বিধান। নাম তার কি হবে?...ওগো সুবিচারক! আমার বিচার,

আমার বাবার বিচার—তুমিই করেছ, আজ তোমার বিচারের ভারও তোমারই হাতে!···সুবিচার কর! সুবিচার—

* * * ঘরের মধ্যেই বাইরের লোক ঢুকে পড়েচে! অবিন্যস্ত পরিচ্ছদটা যখন সুলতা গুছিয়ে দিচ্ছিল, তখনি আমার বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো।...কথা বলবার শক্তি যেন কে জোর করে হরণ করে নিলে!

সুলতা ডাক্‌লে—দিদি! কথা কও!

সম্ভবতঃ এঁরা আমার উন্মাদ চাহনি দেখে চিন্তিত হয়েছিলেন! সাব্যস্ত হয়ে ব'ললাম—অ্যাঁ! সুলতা! কি ভাই?—কথা কইবো? কথা নেই সুলতা! বাবার সঙ্গে সঙ্গে কথাও লুকিয়ে গেছে!

কেষ্টই আবার সকল কথা খুলে বললে। রণজিৎবাবু বললেন—খবরের কাগজে বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু পুলিশ কোন সন্ধান করতে পারে নি।

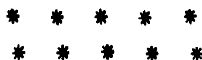
রেলওয়ে পুলিশের বাবুটি বললেন—এইবার করবে।···কিনারা না পেলে কি সন্ধান হয় মশায়?

আমি মিনিট কতক চুপ করে ভাবলাম। বাবা চলে গেছেন! একটা মুখের কথাও আমাকে জানিয়ে যাবার সুযোগ হয়নি তাঁর! কিন্তু জগতে একদিন মা-বাবাই আমাকে নিয়ে এসেছিলেন, এ জগতের মায়া-মমতাও তাঁরাই জানিয়ে দিয়ে গেছেন। যতদিন বাঁচবো ততদিনই এই মায়া মমতার জ্বালায় জ্বলে মর্‌তে হবে! পিতৃশোক চাপা থাক্‌—আমার নির্জ্জনতার সাথী হয়ে!···ঘুমের আড়ালে, স্বপনের ক্রম-প্রসারিত আসরে,অতি বড় বিপদের নিষ্ঠুর মুহূর্ত্তেও নিমেষে নিমেষে

বাবার সাকারমূর্ত্তি নয়নের সম্মুখে ভেসে উঠবে! বক্ষের স্পন্দনে স্পন্দনে পিতৃ-স্নেহের সাড়া পাবো আমি!...চোখের জলের পিতৃতর্পণ আজ নয়!

টেবিলের উপর মাথা নত করে, আজ সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা জানালাম—তুমি আদি, তুমিই অনাদি! তুমি সৃষ্টি কর, ধ্বংসও তোমারই বিধান! কিন্তু সৃষ্টির সময় এটুকু কেন ভুলে যাও ঠাকুর! যে,—মোহনবাবুর মত লোককে তৈরী করে তোমার আপন ব্রহ্মাণ্ডের কত নিরীহ প্রাণী চোখের জলে বুক ভাসায়! কত লোকের মুখের অন্ন উড়ে চলে যায়! স্নেহের অমৃত সরোবরে কত বাজ পড়ে! কত নদী শুকিয়ে আসে—কত তরু দগ্ধ হয়ে যায়!...আমার সর্ব্বনাশ হয়েচে হোক্! সহ্য করবার শক্তি তোমাকেই দিতে হবে। কিন্তু এই অনাথিনী পিতৃহারা নারীর অশ্রুই যেন তোমাকে মোহনবাবুর মত পাপীকে সুমতি দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে—শুধু এই ভিক্ষাই আজ চেয়ে রাখ্‌লাম ঠাকুর! আজ তোমাকে স্মরণ করে— এই আমার শ্রেষ্ঠ পিতৃতর্পণ! তুমি জীবের জন্যই আছো!—তুমি সর্ব্বগুণাধার, কিন্তু তবু কেন মাঝে মাঝে ভুলে যাও যে, তুমি সর্ব্বান্তর্যামী!......

ভাবে বিভোর হয়ে ছিলাম। কার স্নেহস্পর্শে সচকিত হয়ে দেখি—রত্নাকরবাবু!



রণজিৎবাবুকে টেলিগ্রাফ করেছিলেন, তাই তাঁর আসবার সময় ষ্টেশনে হাজির হয়েচেন।

আমাকে দেখে, রত্নাকরবাবুর যে কতখানি বিস্ময় এসেচে—তা তাঁর মুখ দেখেই বুঝ্‌তে পারলাম। এতক্ষণে মনে হচ্ছে—হয়তো সংসারে এখনো স্নেহ-দয়া-মায়া আছে। হয়তো আমি বাঁচতে পার্‌বো।

কেষ্টকে কোনরকমেই পুলিশ ছাড়লে না। তবে ভরসা দিলে—তার সাজা যাতে লঘু হয় সে ব্যবস্থা তাঁরা করবেন। কেননা—সে বালক।...

আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা রওনা হয়ে পড়লাম। রত্নাকরবাবুর বাড়ী যেতে হলে ষ্টেশন থেকে প্রায় দশমাইল রাস্তা গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা।

ইতিপূর্ব্বে আমরা যে গাড়ী ঠিক করেছিলাম, সেখানি স্থলতা ও রণজিৎবাবুকে ছেড়ে দিয়ে, রত্নাকরবাবুকে বললাম—রণজিৎবাবু আপনার বাড়ী চেনেন তো ?—যেতে পারবেন ?

—হ্যাঁ অনেকবার গেছে। কিন্তু সবচেয়ে একটা ভাল ব্যবস্থা আছে, যদি আপনারা রাজী হন। এখান থেকে নৌকো করে গেলে দেরী হয় বটে, কিন্তু যাওয়া যায়—ভা-রি আরামে। ছোট্ট নদী, দু'পাশি ঘন জঙ্গল আর মাঝে মাঝে দু-দশখানা ঘর—নেহাৎ এক টুক্‌রো গাঁয়ের মত।...রাতের বেলায় বেশ মজা লাগে। যাবেন ?

সুলতা এতক্ষণ সলজ্জ হয়ে ছিল। রত্নাকরবাবুর সাম্‌নে মুখ পর্য্যন্ত খোলে নি। হঠাৎ সে বলে উঠ্‌লো—খুব ভাল হবে। তাই চলো দিদি!

রত্নাকরবাবু আর কারো মতামত জান্‌তে চাইলেন না। যে গাড়ী-খানা ঠিক করা ছিল, তাতেই চেপে আমরা নদীর ঘাটে উপস্থিত হ'লাম।...

...ছোট্ট নদীর ছোট্ট বুকখানি চিরে যখন নৌকো ভাসলো—তখন অনেক রাত!

চাঁদ পশ্চিম আকাশে মেঘের কোলে লুকিয়ে ছিল।

রত্নাকরবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—ষ্টেশন থেকে আপনাদের বাড়ী আস্‌তে হলে, গিয়ে আবার পিছিয়ে আস্‌তে হয়?

রত্নাকরবাবু বল্‌লেন—গরুর গাড়ীতে গেলে এত হয় না। আমাদের দেশের জলপথের ব্যবস্থা আর দেরীর ব্যবস্থা একই কথা।...যে ষ্টেশনে আপনারা নাম্‌লেন, নদীর বাঁকে পড়ে ঘুরতে ঘুরতে—তার আগের ষ্টেশনের কাছাকাছি পর্য্যন্ত যেতে হবে। অবশ্য নদীর ঘাট সে ষ্টেশন থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে।

আমি কত কি যে বলবো—আজ তার ফর্দ্দ হারিয়ে গেছে! বহু-দিনের সঞ্চিত ব্যথা শুধু এই একটি মাত্র লোককেই জানাবার জন্য কত না ভেবেচি—কত ব্যথাই না স'য়েচি!

রণজিৎবাবু বললেন—হ্যাঁরে রতন! তোর বিশিষ্ট আত্মীয়টি কে? এমন আপনজন কে তোর ছিল? অথচ তাঁর মৃত্যু হল—তবু এতটুকু দুঃখ করতে দেখলাম না!

রত্নাকরবাবু জবাব দিলেন—আত্মীয়ের সম্পর্ক জান্‌তাম না, তাই 'বিশিষ্ট' বলেছিলাম। আমার মা একটি দুঃখী বৃদ্ধাকে ঘরে জায়গা দিয়েছিলেন।···প্রায় বছর দুই ধরে সে আমাদের বাড়ীতেই বাস করতো। বুড়ীর একটা ছেলে ছিল, কিন্তু কোথায় চলে গেছে—খোঁজ খবর নেয় নি। খেতে পেত না। একদিন ভিক্ষে করতে এসে মায়ের নজরে পড়ে যায়। তারপর থেকেই আমাদের বিশিষ্ট আত্মীয় হয়ে, আমাদের বাড়ীতেই ছিল,—গেল-ও আমাদের বাড়ী থেকে।

—কিন্তু তারজন্যে হঠাৎ বাড়ী চলে আসা, তারপর আমাকে টেলিগ্রাফ করা ···

রত্নাকরবাবু বললেন—মায়ের আমার কর্ত্তব্যজ্ঞানটুকুই জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত। গাঁয়ে ভাল ডাক্তার নেই, অসুখ বেশী হয়েছিল, তাই··· কিন্তু তোকে টেলিগ্রাফ করার অন্য কারণ— মায়ের হুকুম।

রণজিৎবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু কেন জানিস ?

রত্নাকরবাবু জবাব দিলেন—মার হুকুম মার মুখ থেকেই শুনতে পাবি রণজিৎ, আমি বলবো না।···কিন্তু হঠাৎ যে উঠে দাঁড়ালেন—সুপ্রিয়াদেবী ?

আমি সত্যসত্যই উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। বললাম—নানা জ্বালায় কর্ত্তব্য ভুলে গেছি। বাবার মৃত্যু সংবাদ শুনেও এখনো স্নান করলাম না !···নৌকোখানা একটিবার—

রত্নাকরবাবু মাঝিদের বলতেই, একটা অত্যন্ত আঘাটায় নৌকা লাগলো।

অন্ধকার ! পথ দেখা যায় না ! তার উপর টিপি টিপি বৃষ্টি !

রত্নাকরবাবু বললেন—আর একটু এগিয়ে চলুন ! ভাল ঘাটে নামবেন।

আমি দৃঢ় হয়ে বললাম—এতক্ষণ ভুলে ছিলুম, এই আমার যথেষ্ট দোষ হয়েচে। আর অপেক্ষা করতে বলবেন না।

আঘাটাকেই ঘাট ভেবে নিয়ে, নামতে যাচ্ছি, সুলতা বললে—দাঁড়া রে ! —আমিও সঙ্গে যাই।...তাঁকে চোখে দেখবার ভাগ্য পাই নি। কিন্তু তুই যদি আমার বোন্ হয়ে থাকিস সুপ্রিয়া ! তাহলে তোর বাবা—আমারই বাবা !...আমি নাইবো।...

দুই বোনে স্নানে নেমেছি। দুই বন্ধুতে নৌকায় গল্প করছেন। একজন মাঝি, আলো হাতে তীরে দাঁড়িয়ে আছে।

এক গলা জলে দাঁড়িয়ে পিতৃ-তর্পণ করলাম।—বাবা ! বাবা !—আমাকে শান্তি দাও ! দারুণ অশান্তির বোঝা নিয়ে অনিচ্ছায় চলে গেছ তুমি !—আমি যদি শান্তির মুখ না দেখি, তা হলে সব চেয়ে দারুণ অশান্তি যে তোমাকেই ভোগ করতে হবে বাবা !...

কিন্তু—একি ! আমাদের দুজনকার মাঝে—একটা মৃতদেহ !—ভাসচে !

দুজনেই ভয়ে চীৎকার করে উঠলাম। রত্নাকর বাবু তাড়াতাড়ি নেমে এলেন। মাঝিটা আলো নিয়ে কাছে আসতেই, আমি ও সুলতা এক সঙ্গে বলে উঠলাম—কি সর্ব্বনাশ !

মৃতদেহ নয় ! অর্দ্ধমৃতের দেহ ! সংজ্ঞা নেই—কিন্তু প্রাণ আছে।

—মোহনবাবুর এবার আর ছদ্মবেশ নয়।...কিন্তু কেমন করে এলো ! লোকটার অদৃষ্ট ভেবে আজ আমারও দুঃখ হল। আমার চেয়েও এ বেচারী অভাগা !...শান্তির সঙ্গে কখনো যার সখ্য হয় না, তার চেয়ে ভাগ্যহীন আর কে আছে ?

ধরাধরি করে মোহনবাবুকে নৌকোয় তোলা হল। রত্নাকর ও রণজিৎ বাবু দুজনেই ছিলেন—ডাক্তারী কলেজের ছাত্র। যথারীতি শুশ্রূষা চলতে লাগলো।

কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—মোহন বাবুর গলার ক্ষত দেখে। সেই যে, বড় দুঃসময়ে তার পাপ-কবল হতে আত্মরক্ষার জন্য আমি কাম্‌ড়ে ধরেছিলাম—সেই ক্ষত! এরই জন্যে সে ভিখিরী সেজেও গলায় কাপড় জড়িয়ে রেখেছিল। কাবুলেওলা সেজেও পাগড়ীটা গলার সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে ভোলে নি। কিন্তু নদীর জলে ভেসে ভেসে সেই ক্ষত এমন সাদা হয়ে গেছে!—আর জলের মাছে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে তার এম্‌নি অবস্থা করে দিয়েছে, পরম শত্রু হলেও, দেখে গা শিউরে ওঠে!

তখনও অজ্ঞান। সুলতার সর্ব্বনাশ আমার সর্ব্বনাশ দুজনের সর্ব্বনাশ সমান সমান না হলেও—সর্ব্বনাশ। কিন্তু আজ মেয়ের মত বোনের মতই আমরা তার সেবার ভার গ্রহণ করলাম।

তখনই রত্নাকরবাবুর সাম্‌নে, তাঁর কাছ থেকে পরিচিত হয়ে ফিরে আসার পর, বাড়ীতে গিয়ে কি বিপদে পড়ি, এবং আজ পর্য্যন্ত কি ভাবে আমার চলেছে, সমস্ত একটি একটি করে খুলে বললাম। সুলতার কথাও বাদ দিলাম না।

রত্নাকরবাবু বললেন—আমার প্রতিজ্ঞা মত ঠিক তিন দিনের দিন আপনাকে খুঁজতে যাই, কিন্তু মহা দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরে আসি। তারপর থেকে কলেজে হাজ্‌রে দিই নি, সময়ে নাওয়া খাওয়া হয় নি, সারা

ক'লকাতাটাই খুঁজে বেরিয়েছি।...মাত্র এই দু তিন দিন বাড়ী আসতে হয়েচে...

আমি বললাম—এর জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। আর দুঃখই বা করবো কি! সর্ব্বাঙ্গে কাঁটার মালা, ফুলের জায়গা আজ পাবো কোথায়?

রত্নাকরবাবু স্মিত মুখে বললেন—ফুল গাছেও কাঁটা থাকে সুপ্রিয়া দেবী, কণ্টকের মালাও ভাগ্যের গুণে পুষ্প-মালা হয়।

—সে সব ভাগ্য আমাদের ভাগ্যের সঙ্গে মিশ খায় না। কিন্তু আমার যে একটা বড় দরকারী কথা ছিল!—যদি দুজনেই শুন্‌তেন আপনারা...

রত্নাকরবাবু হেসে বললেন—আপনার কথা কোনো দিনই শুনবো না বলিনি। তবু যদি শুন্‌বো বললেই আপনার বেশী আনন্দ হয়, তাহলে বলুন—শুন্‌বো।

—এই যে সুলতাকে দেখছেন, এর অতীত ইতিহাস শুন্‌লেন। কিন্তু তবু সমাজে ও আশ্রয় চায়। ওর বুকের অতৃপ্তি, আর সাহস, দুটোয় মিলে, দণ্ডে দণ্ডে সাধ জাগিয়ে দিচ্ছে—আমাকে আশ্রয় দাও! আমার সব-হারানো প্রাণকে আপন করে নাও!...আজ যদি বলি—রণজিৎবাবু আর আপনি চেষ্টা করে সুলতার দুঃখ ঘুচিয়ে ফেলুন, রাজী হতে পারবেন?

রত্নাকরবাবু জবাব দিলেন—সফল হবো কি না, তা জানি না, কিন্তু রাজী হলাম সুপ্রিয়া দেবী। সর্ব্বান্তঃকরণে রাজী আমি।

—আর উনি?...রণজিৎবাবু?

রণজিৎবাবু দৃঢ় স্বরে বললেন—নিশ্চয়ই রাজী। আমি কর্ত্তব্য মনে করি।

সুলতা তখন মোহনবাবুর মুখে জল দিচ্ছিল।—তার তখনো জ্ঞান হয় নি।

আমি বললাম—মিনতি জানাই—রণজিৎবাবু!—আপনি বিবাহিত কি না জানি না। যদি না হন, তা হলে সুলতাকে সঙ্গী করে নিন। গঙ্গাজলে ধুয়ে নিলে কোন জিনিষেরই পবিত্রতা নষ্ট হয় না।…মনের পবিত্রতাই সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি রণজিৎবাবু!

রত্নাকরবাবু রণজিৎবাবুর মুখপানে চাইতেই, তিনি মাথা নত করে, আস্তে আস্তে বললেন—সুলতা দেবীকে প্রথম দেখার পর থেকে, আমি ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই জানিয়ে এসেছি রতন!…

আমি বললাম—কিন্তু আপনার গুরুজন? তাঁরা যদি—

রণজিৎবাবু বললেন—সে দিকের জন্য চিন্তা করবেন না। আমি আপন মত বাহাল রাখি। যা ভাল, তাকে মন্দ বলবার দুর্ভাগ্য আমি কোনো দিনই চেয়ে আসিনি। ভগবান আমার মন বুঝবেন এবং সাহসও তিনিই দেবেন।

আমি মোহনবাবুর মৃত্যুমলিন মুখপানে চেয়ে, সুলতাকে বললাম—রাজী সুলতা?…চেয়ে দেখ—ঐ তোর স্বামী!

সুলতা উঠে দাঁড়িয়ে রণজিৎবাবুকে প্রণাম করে, রত্নাকরবাবুরও পদধুলি নিলে। তারপর আগের মতই মোহনবাবুর শুশ্রূষা করতে লাগলো।

নানা কথাবার্ত্তায় পথের দেরী জানায় নি। ইতিমধ্যে রণজিৎ

বাবুও সুলতাকে সাহায্য করতে মোহনবাবুর পার্শ্বদেশ দখল করে বসেচেন।

আমি রত্নাকরবাবুকে বললাম—আমার পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য আপনার সাহায্য চাই। তা ছাড়া হয়তো সমস্ত জীবনটাই...

রত্নাকরবাবু ম্লান হাসি হেসে বললেন—যাকে এত আপনার ভাবেন, তাকে অপমান করতেও আপনার সাধ হয় সুপ্রিয়া দেবী? অতি বড় দুর্দ্দিনে আমি ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণার মুখ মনে পড়েনি আপনার, তাই আমারই কাছে ছুটে এসেচেন।...আজ বর্ত্তমান-ভবিষ্যতের চিন্তাটুকুর ভার দিতেও আপনি আমাকে কুণ্ঠা দেখাবেন?...ব্যবহারে এমন কি গোলমাল দেখিয়েছি সুপ্রিয়া দেবী?...আমি ব্রাহ্ম হলেও, হিন্দু-সন্তান, গোঁড়া হিন্দু—মা আমার সাক্ষাৎ দেবী! তাঁর চরণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করবো—আপনার ভবিষ্যতের ভার আমারই! এখনো বলছি—নির্জ্জন রাত্রির নিশীথ প্রহরে, মরণোন্মুখ এই অভিশপ্ত আত্মার সাম্‌নে—আজ থেকে রত্নাকর রায় সুপ্রিয়া দেবীর একমাত্র——

—"কে কে!—কার নাম করলে গো!—সুপ্রিয়া—সুপ্রিয়া!"

মোহনবাবুর জ্ঞান হয়েচে! সে-ই আমার নাম শুনে চমকে উঠলো! কাছে এগিয়ে গেলাম।

সে তখন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চাইছে। ক্ষীণ স্বর নয়,—বেশ সতেজ, স্পষ্ট! বল্‌ছে—তোমার বাবাকে মেরেছি, হত্যা করেছি—সুপ্রিয়া! তোমাকেও...হ্যাঁ—হত্যাই একরকম!...কিন্তু তবু কেন পেছু নিয়েছিলাম জানো?—তোমাকে আর সেই ছুঁড়ি সুলতাকে একদম্ শেষ করবো বলে। তোমরা বেঁচে থাক্‌লে—আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে,

আমি জেলে যাবো,—তাই বাধা সাফ করতে গিয়ে সকল বাধায় জড়িয়ে পড়লাম।…রেলগাড়ীর পায়খানায় লুকিয়েছিলাম—কেষ্টকে ঘুম পাড়িয়ে। পায়খানায় ঢুকে বসেছিলাম, তোমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেচ খালি আসল জায়গা দেখতে চাওনি।...তারপর পরের ষ্টেশনে এলাম, পুলিশের তাড়ায় ছুটতে ছুটতে নদীর বুকে ঝাঁপ দিলাম।—সন্ধ্যার আঁধারে কেউ টের পেলে না।...কিন্তু একজন যে পাবেই টের!…তাই তো আজ তোমাদের অনিষ্ট করতে দাঁড়িয়ে তোমাদেরই আশ্রয়ে জীবন ভিক্ষার জন্য হাত পেতে রয়েচি।

আমি বললাম—এ সব কথা পরে বলবেন। এখন আপনি অসুস্থ।

মোহনবাবু চট্ করে উঠে বসলো। বীভৎস চাউনি চেয়ে বললে—সম্পূর্ণ সুস্থ সুপ্রিয়া!...অসুখ আমার মনে। আতঙ্কে প্রাণ যায়।... এখানকার আর কাকেও চিনি না আমি, কিন্তু তুমি, তুমি যদি সাহস দাও তো বলি—সুপ্রিয়া!

—বলুন না।...কি বলবেন? আমাকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে চিবিয়ে খাবেন? কি চান আপনি?...

—আমাকে অজ্ঞাতবাসের অনুমতি দাও সুপ্রিয়া! পুলিশের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও! বড় ভয় হয় সুপ্রিয়া! শান্তি নেই আমার। দারুণ বিভীষিকা!...বাঁচাবে সুপ্রিয়া? দেবে উপায় ঠিক করে?

আমি কিছু না বল্‌তেই, রণজিৎ বাবু বলে উঠলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ দেবে। ব্যস্ত কেন? দেবে। উপকার করেছ, প্রত্যুপকারের দাবী তো তোমার ষোল আনা।......

**   **   **

ঘাটে পৌঁছে গেছি। ভোর তখন।

রত্নাকরবাবুর বাড়ী এসে, তাঁর মায়ের চরণধূলি নিলাম। হ্যাঁ—স্নিগ্ধ, শান্তিঢালা এই কোল! যদি আশ্রয় পাই, ধন্য হয়ে যাবো।

ওদিকে রণজিৎবাবু বেলা আটটা বাজতে না বাজতেই, এক মাইল দূরের থানায় লোক পাঠিয়েছিলেন। পুলিশ এসে, যথারীতি মোহনবাবুকে সসম্মানে বেড়ী পরিয়ে নিয়ে গেছে। মকদ্দমা বাধলে আমাকেই হতে হবে প্রধান সাক্ষী, সুলতাকেও বসে থাকলে চলবে না।... বাবাকে মৃত্যু উপহার দিয়েছে,—আমার মহা উপকারী বন্ধু! সাক্ষী হবো বই কি। না হলে যে উপকারীর উপকার শেষ হবে না।...কিন্তু কেষ্টা ছোঁড়া যেন রক্ষা পায়। অপরাধী হলেও তাকে সাজা দিতে আমার প্রাণ চায় না।......

বেশ গ্রাম। শ্যামল প্রকৃতির এলায়িত দেহের উপর সূর্য্যের তীব্র তেজ ছড়িয়ে পড়েছে। আজ যেন মনে হচ্ছে—যুগান্তকাল ধরে জীবন-মাঝে বর্ষণ ধারা নেমে এসেছিল, এতদিনে সূর্য্যের আলোয় শুকিয়ে গেল। আজ তুফান থেমেচে—রৌদ্র হেসেচে। বিপদ লুকিয়ে গেছে—আনন্দকে তার আসন ছেড়ে দিয়ে।

...রত্নাকর বাবুর মা সত্যসত্যই দেবী। তাঁর আদর-যত্নে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

মাতৃস্নেহের অক্ষয় ভাণ্ডারে এত কাল ইনিই যেন ভাণ্ডারী হয়ে আছেন......

সেই দিনই নাকি পঞ্জিকায় খুব ভাল দিন ছিল। গ্রামের একজন

পুরোহিত ডেকে, সুলতার সঙ্গে রণজিৎ বাবুর শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল। অভিভাবকের কাছে যা কৈফিয়ৎ দিতে হবে, নবদম্পতী এর পরে, ভেবে চিন্তে ঠিক করবে—এই রকমই একটা কথা সুলতা এবং রণজিৎ বাবু উভয়ের মুখেই শুন্‌তে পেলাম। ব্যবস্থা ভালই বলতে হবে।

কিন্তু সবার ব্যবস্থা তো সুশৃঙ্খলায় শেষ হল, এইবার আমার ব্যবস্থা কি হবে ? রত্নাকর বাবু যখন আশ্রয় দিয়েছেন, তখন মোহন-লালের মত দোসরা কুচক্রীর বা পিশাচের অত্যাচার সইতে হবে না—এ বিশ্বাস আমার দৃঢ় হ'য়ে রয়েচে।

এ যেন উচ্চ আশা...কিন্তু যা থাকে কপালে! ভাববো আর কত ?

পরদিন বিকেলের দিকে, রত্নাকর বাবু এসে বললেন—একা একা বসে রয়েচেন! বর-কনেকে আশীর্ব্বাদ করবেন না ?

আমি বিস্মিত হয়ে চাইতেই, তিনি বললেন—রণজিৎ দেশে চল্‌লো। সুলতাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে, আবার ক'লকাতায় ফিরে যাবে।

আমি বললাম—তাঁকে নিষেধ করুন। সুলতাকে বিপদে পড়তে হবে। সমস্ত ঘটনা অভিভাবকদের কাছে না জানিয়ে, হঠাৎ—

ঠিক সেই সময়েই রণজিৎবাবু হাজির হয়ে বললেন—ভবিষ্যৎ আমি ভেবেচি সুপ্রিয়া দেবী! আশীর্ব্বাদ করুন, বিপদ হ'তে যেন মুক্তি পাই। ভয় দিয়ে যার গোড়া পত্তন, মাঝের ভিত্তি সেখানে সাহসে দাঁড়ায় না। আমি আজই যেতে চাই সুপ্রিয়া দেবী!

সুলতার অদৃষ্ট আর আমার অদৃষ্ট বাস্তবিকই যদি এক সূত্রে গাঁথা হয়ে থাকে, তা হলে আমি সুখে থাক্‌লে সে কখনো দুঃখ পাবে না।......

...গোধূলি লগ্নে—দম্পতী শুভ যাত্রা করলো। আহা! বেচারী সুলতা!—বড় অভাগিনী!—সুখে থাক্। সুখী করুক।...

...আজ আমার বড্ড ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌চে। খালি মনে হয়—হয়তো বা বর্ষণ-শেষেই কখন বিনা মেঘে বজ্রপতন হবে। সহিষ্ণুতার সীমা যদি অতিক্রম করে যায়, তা হলে আর কি আমি বাঁচবো?... মরি—তা-ও দুঃখ নেই আজ!...

রত্নাকর বাবুকে একা আর পাচ্ছি না। ধরি ধরি—ধরতে পারি না। এত কি তাঁর কাজ? দিবারাত্রি গ্রামের লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ান, লোকের হাঁড়ির খবর রাখেন, অথচ নিজে তিনি 'ব্রাহ্মধর্ম্ম নিয়েছেন।...

সামান্য একটুখানি রাত্রি হয়েছিল।

আমার জন্য যে ঘরখানা নির্দ্দিষ্ট হয়েচে, তারই মধ্যে বসে বসে ভবিষ্যৎ ভাবচি। রত্নাকরবাবুর অন্তরের সারল্য ভেবে আপনা আপনি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি,—একটি মেয়ে এসে ঘরে ঢুক্‌লো। বালিকা নয়, কিশোরী। পনের-ষোল বয়স হতে পারে।

না চিনলেও, তাকে অভ্যর্থনা করলাম—এসো ভাই!— আমার সঙ্গীটি চলে গেল।—একা একা সময় কাটে না। কিন্তু তোমাকে তো দেখিনি দিদি! কাল থেকে একটিবারও দেখা দিলে না—অথচ আজ হঠাৎ?—

মেয়েটী বললে—এই তো এলাম দিদি !···এসেই তোমার কথা শুনে ছুটে আসচি।

—তোমরা এ গাঁয়ের নও ?

—না। আমার মামার বাড়ী—এই পাশে।...হ্যাঁ দিদি! তুমি না কি খুব বিপদে পড়েছিলে ?···এ বাড়ীর—

—হ্যাঁ ভাই, রত্নাকরবাবু না থাক্‌লে হয়তো বাঁচতাম না।... বাঁচলেও মরে থাক্‌তে হত।

মেয়েটি বললে—ভগবান বাঁচিয়েছেন। মানুষে আর কি করতে পারে।...ইনি তোমায় খুব ভাল বাসেন বুঝি ?

আমি ছোট্ট এই মেয়েটির কাছেও আজ লজ্জিত হয়ে গেলাম।··· আহা! ভালবাসা—!...আর্ত্ত কাঙাল বুভুক্ষু হিয়া আমার! কত কাল আর সয়ে থাকবে !

জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার নামটি কি ভাই ?

মেয়েটি হেসে বললে—বেশ মজা কিন্তু। আলাপ হচ্ছে, অথচ কেউ কারো নাম জানি না। আমার নাম—সুকৃতি। তোমার ?

আমিও হেসে বললাম—সুপ্রিয়া।...সুলতা-সুকৃতি-সুপ্রিয়া। আমাদের সকলকার নামই বেশ মানানসই।

সুকৃতি বললে—সুলতাকে দেখতে পেলাম না।—সে আবার আমার বউদিদি হল।

—সে কি! বউদিদি ? কেমন করে বলতো ? রণজিৎবাবু...

—তিনি আমার মাসতুতো দাদা। তবে একটুখানি দূর সম্পর্ক।

তারপর মেয়েটি সামান্য একটুখানি সলজ্জ হয়ে, অথচ হাসতে হাসতে

বললে—রণজিৎ দাদাই তো আমার বাবাকে চিঠি দিয়েছিল। কাল চিঠি পেয়েছি, আজ বাবার সঙ্গে চলে এলাম।...দাদাই মাঝখান থেকে ঠিক করলে।

এম্‌নি সময় রত্নাকরবাবুর মা এসে বললেন—বা রে! এরই মধ্যে আলাপ জমে গেছে যে!... সুপ্রিয়া!—সুকৃতিকে তোমার কেমন লাগে মা! পছন্দ হয়?

আমি সুকৃতির একখানা হাত ধরে নাড়া দিতে দিতে বললাম—হয় মা!—'বোনটি' বলে মনে হয়।

মা বললেন—রণজিৎকে তো এই জন্যেই 'তার' করেছিলাম। কিন্তু গড়ে পিঠে নিস্‌ মা! রতনকে অনেক বুঝিয়ে তবে রাজী করলাম। দুজনে যেন রাজযোটক হয়।

হঠাৎ সুকৃতির হাতখানা আমার হাত থেকে ভিন্ন হয়ে গেছে!

...বর্ষণের পর রৌদ্র উঠেচে ভেবে আনন্দ করছিলাম। কিন্তু আকাশে মেঘ না জম্‌তেই আজ এ কী দুঃসহ বজ্র-গর্জ্জন! ভগবান! এই বিধান করতেই কি আমাকে এত দূরে টেনে এনেছিলে? ওগো সুবিচারক! তোমার বিচারই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার! আজ আর কোনো প্রার্থনা নাই প্রভু!—শুধু এইটুকু কোরো,—আমার অশ্রু চোখের জলেই যেন তোমার সাড়া মেলে।

শেষ